Pishachini by Md. Jafar Iqbal

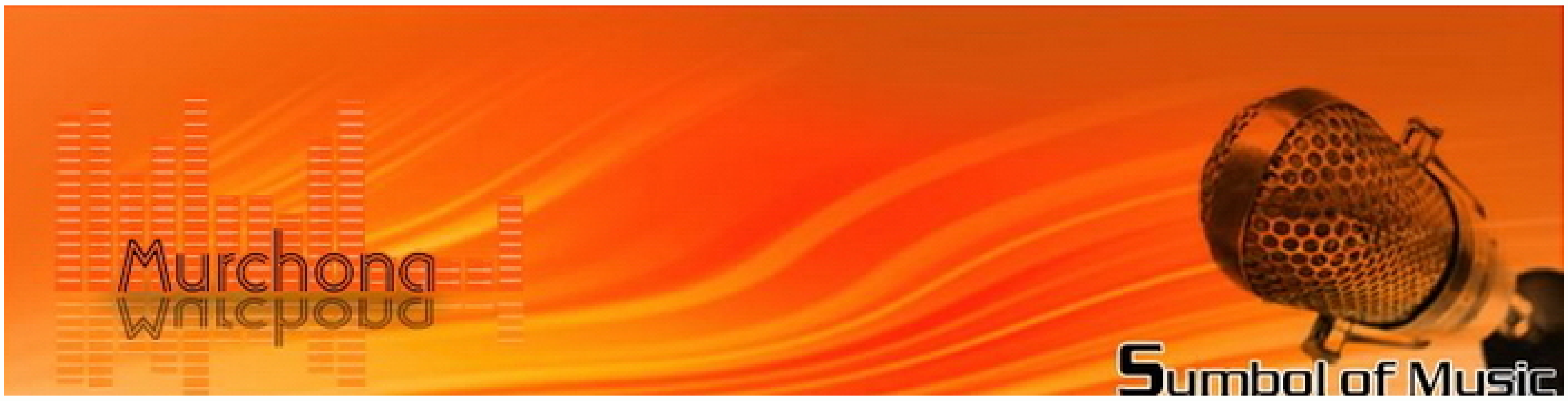

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

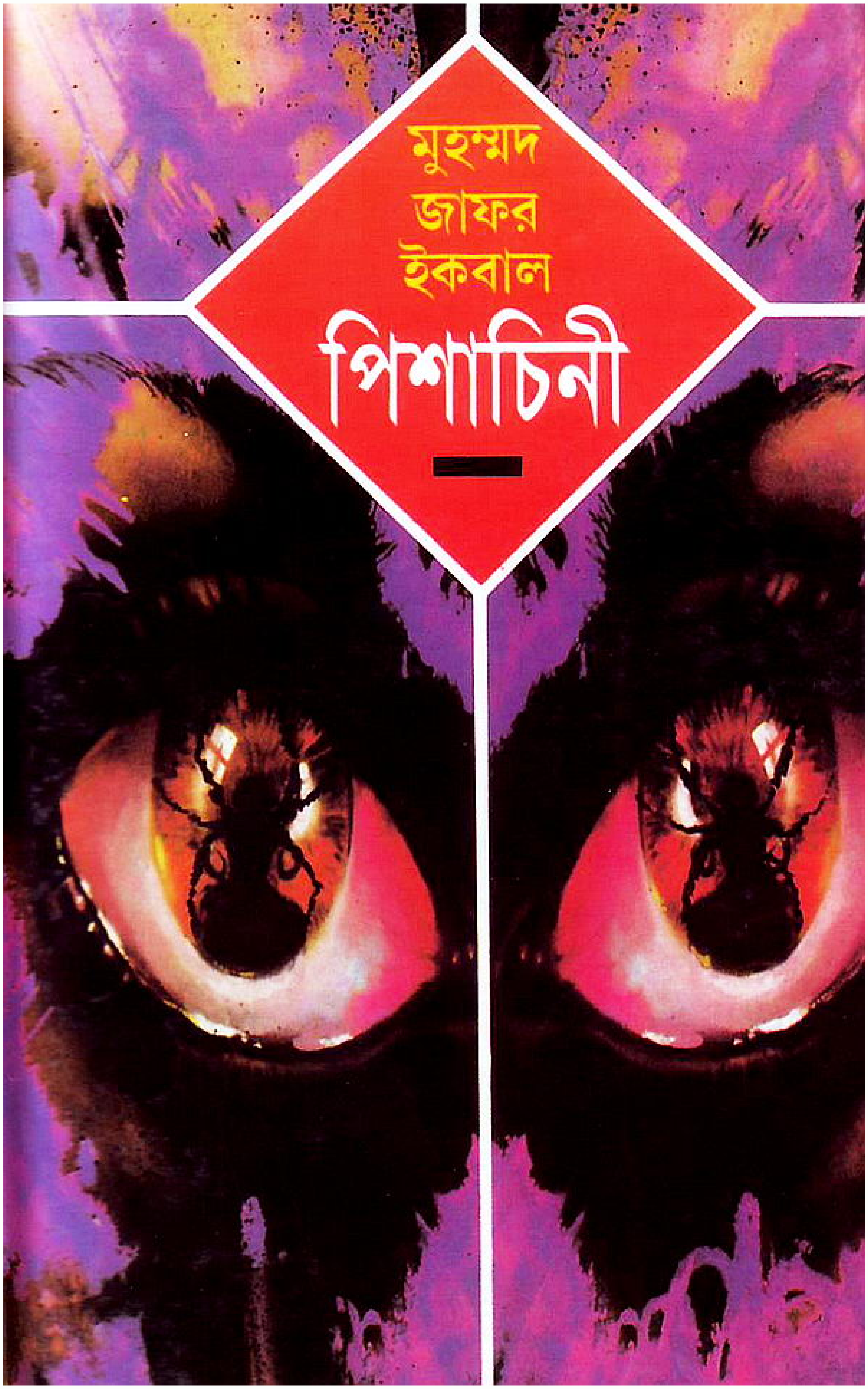
মুহম্মদ
জাফর
ইকবাল
পিশাচিনী

সূচিপত্র

পিশাচিনী ৭
রহমত চাচার একরাত ২৮
সহযাত্রী ৩৭
বন্ধ ঘর ৪৫
গাড়ি ৫৪
মুগাবালী ৬৭
নেকড়ে ৮১
সুতোরন্তু ৯৫
মুতুয়াল পির ১০৯

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

পিশাচিনী

চৌধুরী সাহেব খুব মজা করে গল্প করতে পারেন। প্রথমে হাড়কেপ্পন একজন মানুষ নিয়ে একটা গল্প বললেন। শুনে সবাই এত জোরে হাসা শুরু করে দিল যে পাশের ঘর থেকে সবাই ছুটে এল ব্যাপার কী দেখার জন্য। গল্পটি ভালো, চৌধুরী সাহেবের বলার ভঙ্গিটি আরও ভালো। উৎসাহ পেয়ে চৌধুরী সাহেব আরেকটা গল্প বললেন—এটা পাগলের গল্প। এই গল্পটা আরও হিট হয়ে গেল। বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস, এরকম একজন হাসতে হাসতে পেটে হাত দিয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল। চৌধুরী সাহেব সাবধানি লোক, হাসির গল্প বলার ব্যাপারেও ঝুঁকি নেন না। এর পর থেকে বাকি সময়টা পাগলের গল্পের মাঝেই থেকে গেলেন।

গল্পগুলি ভারি মজার, কিন্তু এত মজার গল্প শুনেও একজনকে দেখলাম মুখ ভারী করে বসে রইলেন। শুধু যে বসে রইলেন তা-ই নয়, শেষের দিকে একটু বিরক্ত ভঙ্গিতে উঠে গেলেন। রসিকতাবোধ নেই, এরকম মানুষ নিয়ে ভারি মুশকিল!

আমরা এসেছি এক বিত্তবান বন্ধুর বিবাহবার্ষিকীতে, সেখানে নানারকম আয়োজন। খাবার শেষে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি, তখন সেই গোমড়ামুখের মানুষটার সাথে আবার দেখা হল। এক কোনায় বসে একটা কাগজ পড়ছেন, তখনও গোমড়ামুখে। ভালো খাওয়া হলে আমার মেজাজও ভালো থাকে, লোকজনের সাথে তখন বেশ গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে দিই। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভদ্রলোকের পাশে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমার নাম জাফর ইকবাল—

লোকটা বেশ অনিচ্ছার সাথে হাত বের করে আমার সাথে মিলিয়ে বললেন, বেশ, বেশ।

সাধারণত এরকম সময়ে নিজের নাম বলে পরিচয় করার কথা। বোঝাই যাচ্ছে গোমড়ামুখের মানুষটা এই সাধারণ ভদ্রতাটুকুও দেখাতে রাজি নন।

www.MurchOna.com

মেজাজটা একটু খারাপ হল এবং আমি মনেমনে তাঁর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেললাম। দরাজ হাসির ভঙ্গি করে বললাম, চৌধুরী সাহেব বেশ জোক বলছিলেন, কী বলেন?

হুঁ।

আপনি দেখলাম মাঝখানে উঠে গেলেন, জোক-ফোক ভালো লাগে না বুঝি?

লাগে। এক শব্দে উত্তর দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে আবার তাঁর কাগজে মন দিলেন। মহা অভদ্র মানুষ!

জোকগুলি আগে শুনেছেন মনে হল, একেবারে দেখি হাসলেন না—

ভদ্রলোক এবারে আস্তে আস্তে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে চশমা খুলে আমার দিকে তাকালেন। খানিকক্ষণ আমাকে খুব ভালো করে লক্ষ করে বললেন, আপনারা যাদেরকে পাগল বলেন, সেটা তাদের একধরনের অসুস্থতার লক্ষণ। মানসিক অসুস্থতা। মানুষের অসুস্থ অবস্থা নিয়ে হাসি-তামাশা হয় না।

মহা সিরিয়াস মানুষ মনে হচ্ছে। আমি চায়ের কাপ টেবিলে রেখে বললাম, সবকিছু এত সিরিয়াসলি নিলে তো মুশকিল। একটা হালকা জোক—

ধনুষ্টংকার হয়ে যখন মানুষ মারা যায়, মৃত্যুর আগে তার সারা শরীর যন্ত্রণায় ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়, সেটা নিয়ে একটা সিক জোক আছে, শুনতে চান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না, মানে, ইয়ে—

আপনার পরিবার-পরিজনের কারও যদি মানসিক অসুস্থতা থাকে—আমি দুঃখিত, পাগল শব্দটা আমি ব্যবহার করতে পারি না, তা হলে আপনি ঐ জোকগুলি শুনে হাসতে পারতেন না।

ভদ্রলোক এবারে আবার আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে চশমাটি পরলেন, তারপর পকেট থেকে আস্তে আস্তে কাগজটা বের করে আবার পড়া শুরু করলেন। ইঙ্গিতটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তুমি এখন বিদায় হও।

আমার একটা ভালো গুণ আছে, সম্ভবত এই গুণটার জন্যেই আমি এই সংসারে টিকে যাব। গুণটা হচ্ছে, সত্যি কথা স্বীকার করে নেওয়া। নিজের গোঁ বজায় রাখার জন্য আমি খামোকা তর্ক করে যাই না। সময়বিশেষে সেজন্য আমি দশজনের সামনে গাধা প্রমাণিত হই, কিন্তু তবুও আমি সব সময়েই খাঁটি কথা মেনে নিই। খানিকক্ষণ চুপ করে ব্যাপারটা একটু ভেবে এবারেও আমি তা-ই করলাম। বললাম, আপনি সত্যি কথা বলেছেন। আমি কখনোই ব্যাপারটা এভাবে দেখিনি। অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার, কিন্তু ব্যাপারটা কেন জানি আমার চোখে পড়েনি। খুব লজ্জা লাগছে ব্যাপারটা চিন্তা করে।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তিনি মোটেও আমার কাছে এরকম একটা উত্তর আশা করেননি—ভেবেছিলেন ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে একটা বাজে তর্ক শুরু করে দেব। সহৃদয়ভাবে হেসে বললেন, আপনার লজ্জার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক।

www.MurchOna.com

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, কৌতূহলটা ক্ষমা করে দেবেন প্লীজ, আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে কেউ কি আছে, যে মানসিকভাবে অসুস্থ?

না, আমার পরিবারে কেউ নেই। কিন্তু আমি একজন ডাক্তার, মানসিক রোগের ডাক্তার। আমি অসংখ্য মানুষকে চিনি যারা মানসিকভাবে অসুস্থ। ভদ্রলোক এবারে তাঁর হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, আমার নাম মইনুল হাসান।

সেই থেকে মইনুল হাসানের সাথে আমার পরিচয়। আমি পরিচয়টা চেষ্টা-চরিত্র করে ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে নিয়ে গেছি। নিজের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু সব মানুষের একটা অসুস্থ কৌতূহল থাকে, আমারও আছে। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার মস্তিষ্ক, যে-সমস্ত দুর্ভাগা মানুষের সেটা থেকেও তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই, তাদের নিয়ে আমার কৌতূহল, তারা কী করে, কেন করে, জানার আগ্রহ। অবসর সময়ে তাঁর কাছে তাদের নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি। কোনো-কোনোটা বেশ মজার, কিন্তু বেশির ভাগই কষ্টের গল্প। একটা গল্প ছিল অস্বাভাবিক গল্প, মইনুল হাসান প্রথমে সেটা বলতেই চাননি। অনেক খোশামুদি করে শুনতে হয়েছে। গল্পটা এরকম, তাঁর ভাষাতেই বলা যাক।

আমাদের দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসা হয় শুধু বড়লোকদের। গরিব লোকজন এখনও মানসিক অসুস্থতাকে তাবিজ কবজ পির ফকির দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে থাকে। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসাই করতে পারে না, মানসিক রোগের চিকিৎসা করবে কীভাবে? সে-কারণে আমার সমস্ত রোগীই বড়লোক। কাজেই যেদিন জামাল চৌধুরী নামে একজন খুব অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী আমার ক্লিনিকে এলেন, আমি খুব অবাক হলাম না। ভদ্রলোক ঠিক কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছিলেন না। এটি নতুন কিছু নয়, পৃথিবীর কোথাও মানসিক ব্যাধিকে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিচার করা হয় না।

খানিকক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করে ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার কাছে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি।

বলুন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, সে-ব্যাপারটা আসলে একটা সমস্যা কি না সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

তবুও বলুন।

ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে নিয়ে।

আমি চুপ করে থেকে ভদ্রলোককে কথা বলতে দিলাম। ভদ্রলোক একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, আমাদের একটা মেয়ে তিন মাস আগে সুইসাইড করেছে।

www.MurchOna.com

আমি একটা ধাক্কা খেলাম। কতই-বা বয়স ভদ্রলোকের, তাঁর মেয়ে আর কত বড় হবে? এই বয়সে সুইসাইড!

মেয়েটা বড় অভিমানি ছিল সত্যি, কিন্তু একেবারে সুইসাইড করে ফেলবে সেটা আমি কখনো ভাবিনি।

কেন করেছিল জানেন?

খুব তুচ্ছ একটা বিষয়ে। মায়ের সাথে খাবার নিয়ে মনকষাকষি। এই বয়সে যা হয়। কিন্তু নীরা—আমার মেয়ের নাম নীরা, একেবারে সুইসাইড করে ফেলল।

আমি খুব দুঃখিত জামাল সাহেব। কীভাবে সুইসাইড করেছিল?

ভদ্রলোক একটু যেন শিউরে উঠলেন। বললেন, শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি বাইরে ছিলাম, খবর পেয়ে কোনোরকমে প্লেনের টিকেট জোগাড় করে পাগলের মতো ছুটে এসেছি। সারা রাস্তা মনেমনে বলেছি, হে খোদা, মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দাও। হাসপাতালে গিয়ে যখন তাকে দেখলাম—এর আগে আমি কখনো পুড়ে-যাওয়া মানুষ দেখিনি—তখন বললাম, হায় খোদা, জীবনে যদি কোনো পুণ্য করে থাকি, তার বিনিময়ে তোমার কাছে একটা জিনিস চাই, তুমি আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রেখো না। খোদা আমার কথা শুনল, মেয়েটা সে-রাতেই মারা গেল।

ভদ্রলোক একটু একটু কাঁপতে লাগলেন। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললেন, একেবারে ফুলের মতো ছিল আমার মেয়েটি, মাত্র তেরো বছর বয়স—

আমি বললাম, জামাল সাহেব, আপনার মেয়ের কথা থাক, আপনি আবার নতুন করে কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার স্ত্রীর কথা বলুন।

জামাল সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার স্ত্রী খুব সুন্দরী মহিলা। লেখাপড়া-জানা ভালো ঘরের মেয়ে। সতেরো বৎসর হল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস কি জানেন? আমার এখনও মনে হয়, আমি আমার স্ত্রীকে ঠিক বুঝতে পারি না।

বুঝতে পারেন না! আরেকটু ব্যাখ্যা করুন।

ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, আমার মনে হয় বন্যার—আমার স্ত্রীর নাম বন্যা, বন্যার মনের ভিতরে রয়েছে একটা দেয়াল। দেয়ালের অন্য পাশে তার নিজের জগৎ। সেখানে আমার ঢোকার অধিকার নেই।

আপনি কি বৈবাহিক জীবনে নিজেকে অসুখী মনে করেন?

অসুখী? জামাল সাহেবকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, অসুখী কি বলব? ঝগড়াঝাঁটি মনকষাকষি সেসব কিছু নেই, কিন্তু দুজন যে খুব অন্তরঙ্গ সেরকমও নয়। সে-হিসেবে বলা যায় যে আমি হয়তো একটু অসুখীই। কিন্তু সেভাবে

www.MurchOna.com

হিসেব করলে মনে হয় অনেকেই অসুখী। আমার সমস্যা সেটা নয়। আমার সমস্যাটা হচ্ছে অন্য জায়গায়। জামাল সাহেব একটু ইতস্তত করে থেমে গেলেন।

আমি বললাম, বলুন।

আমার কেন জানি মনে হয় আমার মেয়ে নীরা যে মারা গেছে সেজন্যে বন্যার দুঃখটুঃখ বেশি হয়নি।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, এটা তো আপনি একটা খুব গুরুতর কথা বললেন জামাল সাহেব!

হ্যাঁ, আমি বলছি। আমার আরেকটা ছেলে খুব ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল। আমি তখন দেশের বাইরে ছিলাম, ফিরে আসতে আসতে কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হয়, তখন বন্যার খুব বেশি দুঃখ হয়নি। তখন বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম, একেকজন মানুষের শোক-প্রকাশের ভঙ্গি একেক রকম।

আপনার ছেলে কীভাবে মারা গিয়েছিল?

পানিতে ডুবে। বাসায় শখ করে বাথটাব লাগিয়েছিলাম, সেটাই সর্বনাশ হল।

এখন আপনার আর কয়জন ছেলেমেয়ে?

আর একজন—ছেলে। দশ বছর বয়স, ক্লাস ফাইভে পড়ে। জামাল সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কদিন থেকে মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর ভিতরে কোনো একধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে।

অস্বাভাবিক?

হ্যাঁ। মানসিক দিক দিয়ে অস্বাভাবিক। আপনার কাছে আমি এসেছি সেজন্য। আপনি কি আমার স্ত্রীকে একটু দেখবেন? দেখে কি বলবেন সে পুরোপুরি সুস্থ কি না?

দেখব। আমার কাজই এটা।

কিন্তু আমার একটা ছোট অনুরোধ আছে। বন্যাকে আমি আপনার ক্লিনিকে আনতে পারব না, সে কিছু-একটা সন্দেহ করবে। আপনাকে আমার বাসায় যেতে হবে। ডাক্তার হিসেবে নয়, আমার বন্ধু হিসেবে। আমার অনেক টাকা, কিন্তু আপনাকে এই অনুরোধ আমি টাকার জোরে করছি না। আপনাকে অনুরোধ করছি একটা দুখি মানুষ হিসেবে। আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, জামাল সাহেব, অস্থির হবেন না। আমি এমন-কিছু ব্যস্ত মানুষ নই, সময় করে আপনার বাসায় যেতে আমার কোনোই অসুবিধে হবে না।

শুনে জামাল সাহেব খুব আশ্বস্ত হলেন।

www.MurchOna.com

আমি পরের সপ্তাহেই সময় করে জামাল সাহেবের বাসায় গেলাম। জামাল সাহেবের সাথে কথা বলে গিয়েছিলাম, জানতাম তিনি থাকবেন না। গিয়ে দেখি তাঁর স্ত্রীও নেই। আমি হয়তো চলেই আসতাম, কিন্তু তাঁদের দশ বছরের ছেলেটার সাথে দেখা হয়ে গেল।

ছেলেটাকে দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। আমি মানুষের মন নিয়ে কাজ করি, তাই মানুষের চেহারা দেখে কখনো কখনো মন সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করতে পারি। আমার মনে হল এই ছেলেটা একটা মহা বিপর্যয়ের মাঝে আছে, চোখেমুখে তার ছায়া। ঠিক গুলি খাবার আগে বনের পশু শিকারির দিকে যেভাবে তাকায়, চোখের দৃষ্টি অনেকটা সেরকম।

ছেলেটার নাম টিপু, সে প্রথমে আমার সাথে বিশেষ কথা বলতে চাইল না। কিন্তু আমি বিশেষজ্ঞ মানুষ, কীভাবে মানুষের মনের কথা বের করতে হয় জানি। বড়দের বেলায় ব্যাপারটি সহজ, ছোটদের বেলায় একটু কঠিন। একজন মানুষকে প্রথমবার দেখেই বাচ্চারা তার সম্পর্কে সঠিক একটা ধারণা করে ফেলতে পারে। আমি মানুষটা একেবারে খারাপ না, তা ছাড়া আমি সত্যি তাকে সাহায্য করতে চাইছিলাম, তাই শেষ পর্যন্ত সে আমার সাথে আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করল।

ঠিক এরকম সময়ে তার মা এসে হাজির হল, আর ছেলেটা তার মাকে দেখে কেমন যেন মিইয়ে গেল। আমার সামনে থেকে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল ভিতরে।

জামাল সাহেবের কথা সত্যি, তাঁর স্ত্রী অস্বাভাবিক সুন্দরী। দেখে মনেই হয় না তার তেরো বছরের একটা মেয়ে ছিল। বয়স আন্দাজ করতে বললে কিছুতেই কুড়ি কিংবা বাইশের বেশি কেউ বলবে না। মেয়েটি আমাকে দেখে অবাক হল কি না বোঝা গেল না। আমি আমার পরিচয় দিলাম। মেয়েটি সোফায় বসে আমার দিকে তাকাল আর সাথে সাথে কেন জানি আমার শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠল। চোখ দুটি যেন মানুষের নয়, যেন কোনো এক অশরীরী প্রাণীর। আমার মনে হল এই চোখ দুটি আমার শরীরের প্রতিটি কোষ খুলে খুলে দেখে নিচ্ছে। মনে হল এর কাছে আমার আর কিছু গোপন নেই, কোনোকিছু আর তার কাছে অজানা নেই।

মেয়েটি একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, আমার নাম বন্যা। আপনি বসুন, জামাল এক্ষুনি এসে পড়বে। মঙ্গলবার সে একটু ক্লাবে যায়।

আমি বললাম, আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারব।

দুজন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। মোটামুটি অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি তখন ভাবলাম, অপেক্ষা না করে যে-কাজে এসেছি সেটা শুরু করে দিই,

www.MurchOna.com

দেখি জামাল সাহেবের কথা সত্যি কি না। বললাম, আসলে আমি একটু কাজে এসেছি। ঠিক কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

বন্যা আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে উদ্ধত স্বরে বলল, নীরা কেন আত্মহত্যা করল জানতে চান?

হ্যাঁ। আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম। আমতা-আমতা করে বললাম, আমাকে ওয়ার্ল্ড হেলথ থেকে উন্নতশীল দেশে তরুণ-তরুণীদের অস্বাভাবিক আত্মহত্যার হারের উপর একটা আর্টিকেল লিখতে বলেছে।

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা নয়, আমাকে সত্যিই ওয়ার্ল্ড হেলথ থেকে এ-ধরনের একটা জিনিস লিখতে বলেছে, তবে বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক, উন্নতশীল দেশের মানুষের মানসিক সমস্যার ধারা। আমি আমার কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, বন্যা আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, আত্মহত্যা করা একটা রোগ, এর কোনো কারণ নেই।

আত্মহত্যা করাকে রোগ বলতে চাইলে বলতে পারেন, কিন্তু এর কোনো কারণ নেই সেটা তো হতে পারে না। তা ছাড়া সব রোগেরই কোনো-না-কোনো লক্ষণ থাকে, আমি জানতে চাইছি আপনারা নীরার মাঝে কোনো লক্ষণ দেখেছিলেন কি না।

বন্যা আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, আমার চোখ সরিয়ে নিতে হল।

বন্যা কাটাকাটা স্বরে বলল, সব রোগের লক্ষণ সবাই বুঝতে পারে না। সেজন্যে দরকার এক্সপার্ট, বিশেষজ্ঞ।

আমার কেন জানি সোজাসুজি তার দিকে তাকানোর সাহস হল না ; নিচের দিকে তাকিয়ে বললাম, কিন্তু আপনি তো মা—

বন্যা হঠাৎ আশ্চর্য শুষ্কস্বরে হেসে উঠল। আমি চমকে তার দিকে তাকালাম, মনে হল হাসি থামালেই তার সুন্দর দাঁতের ভিতর থেকে সাপের মতো একটা লকলকে জিব বের হয়ে আসবে। আশ্চর্য একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি!

বন্যা কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে হালকা একটা হাসি। প্রথম দেখে মনে হচ্ছিল মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। এখন আর সুন্দরী মনে হচ্ছে না, দেখতে কেমন জানি ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

এর পর আর আলাপ জমে উঠতে পারল না। আমি আর জামাল সাহেবের জন্যে অপেক্ষা না করেই বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ অন্ধকার থেকে শিশুকণ্ঠে কে যেন বলল, শোনেন একটু।

আমি দাঁড়ালাম। টিপু—। জামাল সাহেবের দশ বছরের ছেলেটা অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম, কী টিপু, কী ব্যাপার?

না, কিছু না। বলে সে দাঁড়িয়ে রইল, চলে গেল না।

কিছু বলবে টিপু?

নাহ্। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল।

বলো, কিছু যদি বলতে চাও। বাসার ভিতরে আসব?

না না না—হঠাৎ সে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল, বাসার ভিতরে না।

ঠিক আছে, তা হলে এখানেই বলো।

আপু আমাকে একটা জিনিস বলেছে।

কী বলেছে?

আপু বলেছে, আপু সুইসাইড করেনি। মা আপুকে মেরে ফেলেছে।

অন্ধকার থাকায় আমার আর কষ্ট করে মুখের বিস্মিত ভাবটা আড়াল করতে হল না। শুধু গলার স্বরটা স্বাভাবিক করে বললাম, তোমাকে কে বলেছে এটা?

আপু।

কিন্তু তোমার আপু তো নেই। কেমন করে বলল?

রাত্রিবেলা আপু আমার কাছে আসে।

ও।

জামাল সাহেবের স্ত্রীর কথা জানি না, কিন্তু এই বাচ্চাটিকে এই মুহূর্তে সাহায্য না করলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে বোনের মৃত্যুতে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। মাকে কোনো-একটা কারণে পছন্দ করে না, তাই নিজের অবচেতন মনে পুরো দোষটি তাকে দিয়েছে। ব্যাপারটি একটু বিপজ্জনকও বটে। যদি বাইরের লোকজন শোনে, জামাল সাহেব আর তাঁর স্ত্রী ঝামেলায় পড়তে পারেন। বাচ্চাটি সত্য এবং কল্পনার মাঝে পার্থক্যটা ধরতে পারছে না। আমি এই মুহূর্তে তাকে নতুন কিছু না বলে তার কথা শুনে যাওয়াই ঠিক করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আপু কি প্রতি রাতেই তোমার কাছে আসে?

না, সব রাতে না, মাঝে মাঝে।

তোমার কি ভয় লাগে?

এখন লাগে না। আমার মাকে বেশি ভয় লাগে।

তোমার আপু আরকিছু বলেছে?

আপু বলেছে, তার দুই হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে মা তার শরীরে কেরোসিন ঢেলেছে। তারপর একটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে চুলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কী অবলীলায় কত বড় একটা বীভৎস কথা বলে ফেলল ছেলেটা! টিপু আবার ফিসফিস করে বলল, অনেক কষ্ট হয়েছে আপুর। আপু যখন অজ্ঞান হয়ে গেছে, মা তখন তার হাত থেকে দড়ি খুলেছে।

আরকিছু বলেছে তোমার আপু?

হ্যাঁ। বলেছে, আমাদের একটা ছোট ভাই ছিল—মা তাকেও পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে। আপুর সাথে আমার ভাইও মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করতে আসে। যেদিন মা থাকে না, শুধু সেদিন আসে। মাকে সে খুব ভয় পায়।

আর কী বলেছে তোমার আপু?

আপু বলেছে, মা এখন আমাকে মারবে। নয় বছর পরেপরে মারার কথা, কিন্তু মা আমাকে আগেই মারবে।

কেন?

কারণ আমি সব জেনে গেছি, সেজন্যে।

তোমার মা তো জানে না যে তুমি জেনে গেছ।

মা চোখের দিকে তাকালেই সব জেনে যায়। সেজন্যে আমি চোখের দিকে তাকাই না। কিন্তু মা প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর আগে বলে, আমার চোখের দিকে তাকা। তখন মায়ের চোখের দিকে তাকাতে হয়। মা জানে যে আপু আমার কাছে আসে। সেজন্যে মা আমাকে আগেই মেরে ফেলবে।

আমার কিন্তু মনে হয় না সেটা সত্যিই হবে। আমার মনে হয়—

হবে। টিপু জোর দিয়ে বলল, অমবস্যার রাতে মা বাবাকে একটা কাজে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। তখন একটা লোক আসবে আমাদের বাসায়, তার একটা চোখ কানা। তখন দুইজন মিলে লুসিফারকে ডাকবে—

লুসিফার! সেটা কে?

শয়তান। শয়তানটাকে মা লুসিফার ডাকে। মা শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি করেছে। মা যখন আমাদের এক-একজনকে মেরে ফেলে, শয়তান তাকে একটা করে ক্ষমতা দেয়। মায়ের এখন অনেক ক্ষমতা—আমাকে যখন মারবে তখন মায়ের এত ক্ষমতা হবে যে আর কেউ মাকে কিছু করতে পারবে না।

এগুলো তুমি কেমন করে জানলে?

আপু বলেছে।

তুমি কোনো বইটই পড়েছ এগুলোর উপরে?

না—আমি বইটই পড়ি না।

তোমার আব্বাকে বলেছ এসব?

না।

কেন?

বলে কী হবে? আব্বা কিছু করতে পারে না। আব্বাকে মা সবসময় কোথাও পাঠিয়ে দেবে।

টিপু হঠাৎ আমাকে বলল, আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার সাথে?

আমার সাথে? আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

www.MurchOna.com

হ্যাঁ। আপনার বাসায়? তা হলে মা আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।

আমি টিপুর মাথায় হাত রেখে বললাম, যদি দরকার হয় আমি তোমাকে নিয়ে যাব। অবশ্যই নিয়ে যাব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কেউ তোমাকে মারতে পারবে না। আমি তোমাকে বাঁচাব।

টিপু আস্তে আস্তে বলল, আপু বলেছে, আমাকে কেউ নেবে না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। মা এখানেই আমাকে মারবে। আপু বলেছে, মরে যাবার সময় অনেক কষ্ট, কিন্তু মরে যাবার পর নাকি কষ্ট নেই। ভালোই নাকি।

তুমি ভয় পেয়ো না, তোমাকে কেউ মারতে পারবে না।

আপু বলেছে বেশি করে রসুন খেতে।

রসুন?

হ্যাঁ। বেশি করে রসুন খেলে নাকি লুসিফার কাছে আসতে পারে না। এই যে আমি রসুন খাচ্ছি। ছেলেটা মুখ হাঁ করল আর ভক করে কাঁচা রসুনের গন্ধ এসে লাগল নাকে।

তা-ই বলেছে?

হ্যাঁ। আর বলেছে একটা বাঁশের কঞ্চি দুই পাশে পুড়িয়ে সাথে রাখতে।

কঞ্চি?

হ্যাঁ।

রেখেছ তুমি?

হ্যাঁ। এই যে—টিপু শার্টের নিচে থেকে বিঘতখানেক লম্বা একটা বাঁশের কঞ্চি বের করল, দুপাশে একটু একটু করে পুড়িয়ে রেখেছে। বলল, এটা সাথে রাখলে লুসিফার আসতে পারবে না।

তুমি ভয় পেয়ো না, তোমার কিছু হবে না।

এই অমাবস্যাতেই মা—

আমি তার আগেই তোমার একটা ব্যবস্থা করব।

সত্যি? টিপু জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। আমি টিপুর হাত শক্ত করে ধরে বললাম, তোমাকে আমি কথা দিলাম। তোমার আপু যদি আসে, তা হলে তাকেও বোলো যে তোমার আর ভয় নেই। আমি তোমাকে বাঁচাব।

বলব। টিপু প্রথমবার একটু হাসল, বলল, আপু শুনে খুব খুশি হবে।

টিপুর কথা শুনে আমার বুকটা প্রায় ভেঙে গেল।

বাসায় আসতে আমার হঠাৎ মনে হল, এমন কি হতে পারে যে টিপু যা বলেছে তা সত্যি? বন্যা সত্যিই একটা পিশাচিনী? সত্যিই সে তার দুই ছেলেমেয়েকে মেরে এখন তার আরেকটা ছেলেকে মারার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে? আমি মাথা থেকে

www.MurchOna.com

জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে দিলাম। আমি একজন ডাক্তার, ভূতের ওঝা নই। টিপু অসুস্থ, তাকে সাহায্য করতে হবে। সে কল্পনা আর বাস্তবের মাঝে পার্থক্যটা ধরতে পারছে না। এই অসুখের নাম স্ত্রীতজোফ্রেনিয়া। মানসিক অসুখগুলির মাঝে সবচেয়ে খারাপ অসুখ এটি।

পরদিন ভোরবেলাতেই জামাল সাহেব হাজির হলেন। তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে জানতে চান। ভদ্রমহিলাকে দেখে একটা অশুভ ভাব হয় এই কথাটি আমি তাঁকে মুখ ফুটে বলতে পারলাম না দুটি কারণে। প্রথমত—গতরাতে তাকে দেখে আমি কেমন একটু ভয় পেয়েছিলাম, দিনের আলোতে সেটা চিন্তা করে এখন আমার নিজেরই লজ্জা লাগছে। দ্বিতীয়ত, আমি একজন ডাক্তার, আমাকে একজন মানুষকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করতে হবে, মনের ভাব দিয়ে বিচার করলে চলবে না। আমি বললাম যে তাঁর স্ত্রীকে আরেকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য না দেখে আমি কিছু বলতে চাই না। গতরাতে তিনি আমাকে সহজভাবে নিতে পারেননি, আলাপ-আলোচনায় তিক্ততা এসে গিয়েছিল।

শুনে জামাল সাহেব কেমন জানি বিবর্ণ হয়ে গেলেন, বললেন, তার মানে আপনি আমার সন্দেহটি অমূলক বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সত্য কথাটি বলা একটু পিছিয়ে দিচ্ছেন।

আমি বললাম, আপনার স্ত্রীর সমস্যা থেকে কিন্তু আপনার ছেলের সমস্যা অনেক গুরুতর।

জামাল সাহেব চমকে উঠলেন, কেন, কী হয়েছে টিপুর?

আমি জামাল সাহেবকে গতরাতে টিপুর সাথে দীর্ঘ আলোচনার কথা বললাম, কী নিয়ে কথা হয়েছে তার খুঁটিনাটি বলে আরও মন-খারাপ না করিয়ে দিয়ে সোজাসুজি বললাম, আপনার ছেলেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসার এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। এমন জায়গায় নিতে হবে যেখানে তার বোনের কোনো স্মৃতি নেই। প্রথম প্রথম সম্ভবত তার মা থেকেও সরিয়ে নেওয়া ভালো। কোনো-একটা কারণে এই মুহূর্তে সে তার মাকে সহ্য করতে পারছে না।

জামাল সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনারা সবাই যে-পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে গিয়েছেন, তার পর এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আরেকটু সময় কেটে যেতে দিন, সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

জামাল সাহেব কোনো কথা না বলে দীর্ঘ সময় বিবর্ণ মুখে বসে রইলেন।

চলে যাবার আগে জামাল সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আমি কয়েকটা জিনিস জেনে নিলাম। সেগুলি হচ্ছে, তাঁর ছেলে আর মেয়ে মারা যাওয়ার সঠিক দিন-তারিখ।

www.MurchOna.com

ঐ দুই দিনই তিনি শহরের বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর একটা ব্যাবসা তিনি দেখাশোনা করেন, সেটার কাজে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়। তাঁর মেয়ের দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে যে-ডাক্তার দেখেছে, তার নামটিও আমি জেনে নিলাম। তারপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এক চোখ নষ্ট এরকম কোনো মানুষ তাঁদের বাসায় আসে কি না। এই প্রশ্নটা শুনে তিনি একটু অবাক হলেন। যখন তিনি শহরের বাইরে যান, তখন তাঁর স্ত্রীর খুব বিশ্বাসী একজন মানুষ এসে তাদের বাসায় থাকে। লোকটির নাম সোলায়মান এবং সত্যিই তার একটি চোখ নষ্ট। টিপু এই লোকটিকে অপছন্দ করে কি না জিজ্ঞেস করলে জামাল সাহেব ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না, শুধু বললেন তাকে ভয় পাওয়া বিচিত্র নয়, কারণ সোলায়মানের নষ্ট চোখটি নাকি খুবই বিসদৃশ।

জামাল সাহেব চলে যাবার পর আমি মোটামুটি একটা অবৈজ্ঞানিক কাজ করলাম। অনেক খুঁজেপেতে একটা বাংলা পঞ্জিকা বের করে জামাল সাহেবের ছেলে আর মেয়ের মৃত্যুতারিখ দুটি পরীক্ষা করে দেখলাম। মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে দেখব টিপুর কথা ভুল, তারিখ দুটি অমবস্যা নয়। কিন্তু আমি হতবাক হয়ে গেলাম, কারণ দেখলাম সত্যি সত্যি সে-তারিখ দুটি হচ্ছে অমাবস্যা।

নিজেকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, সন্দেহপ্রবণ টিপু কোনোভাবে সেটা লক্ষ করেছে। তবুও ব্যাপারটা মনের ভিতরে খচখচ করতে লাগল, কোনদিন অমবস্যা কোনদিন পূর্ণিমা বের করা সহজ ব্যাপার নয়, দশ বছরের বাচ্চার জন্যে তো নয়ই।

ক্লিনিকে বেশি কাজ ছিল না বলে দুপুরবেলা বের হয়ে মেডিকেল কলেজে হাজির হলাম। কিছু পুরানো বন্ধুবান্ধব আছে তাদের সাথে দেখা হবে, তা ছাড়া ইচ্ছে আছে জামাল সাহেবের মেয়েকে যে চিকিৎসা করেছে, কাজী আলমগীর, তার সাথে একটু কথা বলে আসা। বন্ধুবান্ধবকে পেলাম না, কিন্তু ডাঃ আলমগীরকে খুঁজে বের করে ফেললাম। কমবয়সী একজন ইন্টার্নি ক্যান্টিনে বসে চায়ের সাথে সিগারেট খাচ্ছে, ডাক্তারি মতে সিগারেট খাওয়ার জন্যে যেটা নাকি সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর। সামনে বসে পরিচয় দিয়ে আমি তাকে বললাম যে, নীরার দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমি তাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি খুব অবাক হলাম যখন দেখলাম তার বেশ খানিকক্ষণ লাগল নীরার কথা মনে করতে, প্রতিদিন নাকি এত অসংখ্য বিচিত্র রকমের দুর্ঘটনার কেস আসে যে পুড়ে মরার ব্যাপারটি তার তুলনায় কিছুই না।

যখন শেষ পর্যন্ত সে মনে করতে পারল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নীরার ব্যাপারটিতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন?

তেরো বছরের একটা বাচ্চার পুড়ে মরে যাওয়াটি যদি অস্বাভাবিক মনে না করেন, তা হলে না, দেখিনি।

www.MurchOna.com

কিছুই না?

না। চোখমুখ কুঁচকে খানিকক্ষণ সে মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, না, কিছু মনে করতে পারছি না। কেন?

শরীরের কোনো জায়গা বেশি পুড়েছে, কোনো জায়গা কম পুড়েছে—এরকম কিছু?

মনে নেই।

হাত? হাতের কবজি?

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল কাজী আলমগীর, হ্যাঁ, হাতের কবজির কাছে পোড়েনি, আমার মনে পড়েছে এখন। একটু অবাক হয়েছিলাম তখন। আপনি জানলেন কেমন করে?

আমি জানি না, তাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

কিন্তু আন্দাজ করলেন কেমন করে?

করিনি, এমনি বের হয়ে গেছে।

কাজী আলমগীর চোখ সরু করে বলল, আপনি আসলে পুলিশের লোক? মেয়েটাকে আসলে মার্ডার করেছে? হাত বেঁধে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—তাই না?

আমি জানি না।

কাজী আলমগীর আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল।

মেডিকেল কলেজ থেকে যখন বের হলাম তখন আকাশ কালো করে মেঘ করেছে। আমি অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকি। সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে। টিপু যে-কয়টি কথা বলেছে তার একটিও আমি এখনও ভুল প্রমাণ করতে পারিনি। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, কিন্তু তবু মনের ভিতরে কী যেন খচখচ করতে থাকে। অন্যমনস্কভাবে হেঁটে হেঁটে আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলে এসে হাজির হলাম। শয়তানের উপাসনার উপরে এখানে কোনো বই আছে কি না কে জানে!

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলাম। অবেলায় শয়তানের উপাসনার উপরে এতকিছু পড়ে এসেছি যে মাথাটা মনে হয় একটু গরম হয়ে আছে। টিপুর কথা আবার সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, শয়তানের আরেক নাম সত্যিই লুসিফার। যারা শয়তানের উপাসনা করে, তারা পৃথিবীর যা-কিছু ভালো, তার বিরুদ্ধে কাজ করে যায়। জীবিত প্রাণীকে উৎসর্গ করে তাদের শক্তি বাড়ানো হয়। উপাসনায় যখন উপরের স্তরে ওঠে, তখন তারা মানুষকে উৎসর্গ করা শুরু করে। সত্যিই কি বন্যা শয়তানের উপাসক? সত্যিই কি সে নিজের হাতে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে মেরেছে? সত্যিই এখন পরের অমবস্যার রাতে টিপুকে মারবে? অমাবস্যাটা কবে?

www.MurchOna.com

আমি বিছানা থেকে উঠে পড়ার ঘরে এলাম। সেখানে বাংলা মাসের একটা ক্যালেন্ডার আছে, অমাবস্যা পূর্ণিমার কথা সেখানে লেখা থাকার কথা। সত্যিই লেখা আছে। আমি কেমন জানি একটা অস্বস্তি নিয়ে আবিষ্কার করলাম আজ অমাবস্যার রাত। পড়ার ঘরে খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমি শোবার ঘরে ফিরে এলাম। ঘরের ভিতরে অন্ধকার, আমি ঢুকতেই মনে হল কে যেন সরে গেল একপাশে। আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

মনে হল ফিসফিস করে একটা মেয়ের গলার স্বরে কে যেন বলল, টিপুকে কিন্তু ওরা মেরে ফেলবে!

আমি কোনোমতে গিয়ে লাইটের সুইচ টিপে দিলাম। ঘরে কেউ নেই।

আমার শরীর তখনও অল্প অল্প কাঁপছে। আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় বসলাম আমি। এরকম একটা জিনিস কেন শুনলাম? মনের ভুল? তা হলে আমার কি মাথা-খারাপ হয়ে যাচ্ছে? নাকি আমার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছে নীরা?

মিনিট পাঁচেক চুপ করে বসে থেকে আমি জামাল সাহেবের বাসায় টেলিফোন করলাম। দশটা রিং হয়ে গেল, তবু কেউ টেলিফোন ধরল না।

টেলিফোনটা রেখে আমি তখন আমার কাপড় পরা শুরু করলাম। টিপুকে কথা দিয়েছিলাম তাকে আমি বাঁচাব। আমি কখনো ভাবিনি সত্যিই তাকে কেউ মারবে, ওটা ছিল একটা কথার কথা, কিন্তু এখন কেন জানি মনে হচ্ছে টিপুর কথাই হয়তো সত্যি হবে। আসলেই তাকে কেউ হয়তো মেরে ফেলতে চাইছে। আমি টিপুকে কথা দিয়েছিলাম তাকে বাঁচাব, তাকে বাঁচাতেই হবে। কীভাবে জানি না, কিন্তু বাঁচাতে হবে।

বের হবার আগে আমি আবার টেলিফোন করলাম, এবারে সাথে সাথে একজন টেলিফোন ধরল। শুষ্ক পুরুষমানুষের কণ্ঠস্বর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি জামাল সাহেবের বাসা?

সাহেব বাসায় নাই।

কখন আসবেন?

কালকে।

আপনি কে কথা বলছেন?

আমার নাম সোলায়মান।

আমি নিজের অজান্তেই কেমন জানি শিউরে উঠলাম। অমবস্যার রাতে জামাল সাহেবকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে একচোখ-নষ্ট সোলায়মানকে ডেকে আনা হয়েছে, ঠিক যেরকম টিপু বলেছিল। আমি বললাম, টিপুর সাথে একটু কথা বলতে পারি?

কে?

জামাল সাহেবের ছেলে, টিপু।

www.MurchOna.com

অন্যপাশ থেকে দীর্ঘ সময় কোনো কথা শোনা গেল না। আমি বললাম, হ্যালো! কোনো উত্তর শোনা গেল না। সোলায়মান টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

আমি বাসা থেকে বের হলাম দশ মিনিট পরে। রান্নাঘরে কোথায় রসুন রাখা হয় আমার জানা ছিল না। খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। এক টুকরো মুখে দিয়ে দেখলাম জঘন্য গন্ধ! একসময় মাছ ধরার শখ ছিল, কুমিল্লা থেকে একটা ভালো ছিপ জোগাড় করেছিলাম, সেটা থেকে বিঘতখানেক করে গোটা চারেক টুকরো কেটে গ্যাসের চুলায় দুপাশে পুড়িয়ে নিয়েছি। টিপু বলেছিল, এরকম জিনিস সাথে রাখলে লুসিফার কাছে আসতে পারবে না। আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কিন্তু টিপু করে, তাকে সাহস দেবার জন্যে কাজে লাগতে পারে। ঠিক ঘর থেকে বের হবার আগে কী মনে করে আমার এক ভাগ্নেকে ফোন করে দিলাম। সে পেশাদার গুণ্ডা। ভালো রকমের গুণ্ডাই হবে, কারণ শুনেছি সবগুলি রাজনৈতিক দলই নাকি পয়সাকড়ি দিয়ে তাকে হাতে রাখে। তাকে বললাম, কালাম, যদি দুই ঘণ্টার মাঝে তোকে ফোন না করি তুই একটা বাসায় আসবি—

সে বলল, মামা, কী ব্যাপার? আমি এখনই আসি।

আমি বললাম, না। এখন না। যদি তোকে ফোন না করি তা হলে আসবি।

মামা তুমি বলো কী হয়েছে, লাশ ফেলে দেব।

আমি বললাম, লাশ ফেলতে হবে না। ঠিকানাটা লিখে রাখ।

সে ঠিকানাটা লিখে রাখল।

জামাল সাহেবের বাসাটা অনেকটা জায়গা নিয়ে। বাসার চারপাশে বড় বড় গাছ চারিদিক থেকে আড়াল করে রেখেছে। সব দরজা-জানালা বন্ধ, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই ভিতরে কেউ আছে কি নেই। আমি কয়েক মুহূর্ত বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজাটা সাথে সাথে খুলে গেল, মনে হল কেউ যেন দরজার পাশেই আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দরজার ওপাশে আবছা অন্ধকারে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই সোলায়মান। বলল, আসেন, ভিতরে আসেন।

আমার বুকটা কেন জানি ধক করে উঠল, বললাম, না, ভিতরে আসব না। আমি এসেছি টিপুকে নিতে, জামাল সাহেব আমাকে বলেছিলেন—

লোকটা আমার কথার মাঝখানে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি আবার দরজা ধাক্কা দিলাম, আবার দরজা খুলে দিয়ে আবছা অন্ধকারে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, আমি ডাক্তার মইনুল হাসান, টিপুর ডাক্তার। জামাল সাহেব বলে গিয়েছিলেন—

ভিতরে আসেন।

আমার নিজেকে কেমন জানি অসহায় মনে হল, কেন জানি মনে হল মস্ত একটা ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছি। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি ভিতরে

www.MurchOna.com

ঢুকলাম, সাথে সাথে লোকটা দড়াম করে পিছনে হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমার মনে হল কে যেন নারীকণ্ঠে ভিতরে হা হা হা করে অট্টহাসি করে উঠেছে। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল হঠাৎ, দেয়াল ধরে কোনোমতে সামলে নিলাম নিজেকে। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, টিপু কোথায়?

পাশের একটা ঘর থেকে বন্যার গলার স্বর শুনতে পেলাম, এদিকে আসুন।

আমি পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ঘরে লাল রঙের একটা আলো জ্বলছে, অল্প আলো, ভালো করে সবকিছু দেখা যায় না। ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিলের উপর টিপু লম্বা হয়ে শুয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই, সারা শরীরে কোনো একধরনের তৈলাক্ত জিনিস মাখানো। তার মাথার এবং পায়ের কাছে দুটি বড় পাত্র থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ধোঁয়ার কটু গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। টেবিলের অন্যপাশে বন্যা বসে আছে। মাথার চুলগুলি চূড়ার মতো করে বাঁধা। শরীরে পাতলা ফিনফিনে একটা কাপড়, সেটার ভিতর দিয়ে তার সুগঠিত শরীরের পুরোটাই দেখা যাচ্ছে, সেটা নিয়ে তার কোনোরকম জড়তা আছে বলে মনে হল না। ঘরের দেয়ালে বিচিত্র নানারকম ছবি। চারপাশে রাজ্যের জিনিসপত্র ছড়ানো, আবছা আলোতে কোনটা কী বোঝার উপায় নেই।

ঘরের ভিতর আশ্চর্য রকমের শীতল। ভয়ংকর অশুভ একটা পরিবেশ। আমি নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম, এখানে কী হচ্ছে?

আপনি তো ভালো করেই জানেন।

আমি টিপুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি টিপুকে নিতে এসেছি।

বন্যা খিলখিল করে হেসে উঠল, যেন ভারি একটা মজার কথা বলেছি। আমি বললাম, জামাল সাহেব আমাকে বলেছিলেন।

আপনি নিতে চাইলে নেবেন। কিন্তু এখনই না। টিপুর আত্মাটা আমার দরকার। লুসিফারকে কথা দিয়েছি আমি। লুসিফার আসবে এক্ষুনি। ওর আত্মাটা আগে নিয়ে নিই, তারপর ওকে নিয়ে যাবেন আপনি।

আশ্চর্য একটা আতঙ্ক আস্তে আস্তে আমাকে গ্রাস করে নিতে থাকে। কী বলছে এই রাক্ষুসী!

আপনি বসুন। লুসিফারকে দেখবেন আপনি। কয়জনের সৌভাগ্য হয় লুসিফারকে নিজের চোখে দেখার! বসুন।

আমি অসহায়ভাবে বসতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারলাম বন্যা আমাকে সম্মোহন করার চেষ্টা করছে। এখন যদি আমি বসে পড়ি, তা হলে আমি হেরে যাব। মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্যে আমার মাঝে মাঝে রোগীদের সম্মোহন করতে হয়। এ-জিনিসটার সাথে আমি পরিচিত। জোর করে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, আমি টিপুকে নিয়ে যাব। তারপর এগিয়ে গিয়ে আমি টিপুকে স্পর্শ

করলাম, সাথে সাথে বন্যা চিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল, খবরদার, ওকে ধরবি না। মুহূর্তে ভদ্রতার সমস্ত খোলস ফেলে দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে একটা গালি দিল সে।

আমি টিপুর হাত ধরে বললাম, আমি পুলিশকে খবর দিয়ে এসেছি। তারা আসছে।

বন্যা আবার খলখল করে হেসে উঠল, খুব ভুল করেছিস আহাম্মকের বাচ্চা, খুব ভুল করেছিস।

কেন?

পুলিশ এসে দেখবে তুই টিপুকে খুন করেছিস, তুই তুই তুই—জন্মের মতো তুই শেষ হয়ে গেলি!

কেন? সেটা কেন দেখবে?

কারণ তুই খুন করবি, সেজন্যে দেখবে। আমি তোকে যা বলব তুই তা-ই করবি আহাম্মকের বাচ্চা। সবাই করে। টিপুর বাবা চোদ্দ বছর ধরে করে আসছে।

বেশ!

তুই জানিস আমার ক্ষমতা? এই দ্যাখ—বন্যা ঘরের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই দেয়াল থেকে একটা ছবি সশব্দে নিচে পড়ে গেল।

আমি চমকে উঠলেও মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে হাসার ভঙ্গি করে বললাম, আমি এর থেকে অনেক ভালো ম্যাজিক দেখেছি। জুয়েল আইচ মানুষ কেটে জোড়া দিয়ে দেয়।

আহাম্মকের বাচ্চা, এটা ম্যাজিক না।

এটা কী?

তুই খুব ভালো করে জানিস এটা কী।

আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না।

বন্যা মনে হল খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ঠিক আছে, এবারে তা হলে নিজের চোখে দ্যাখ। তারপর দেখি তুই বিশ্বাস না করে পারিস কি না!

আমার ভিতরে কেমন জানি একটা রোখ চেপে গেল। কী করছি না জেনেই হঠাৎ আমি টিপুকে দুই হাতে টেনে তুলে আমার বুকে চেপে ধরে বললাম, ডাকো তোমার লুসিফারকে, বলো আমার কাছ থেকে টিপুকে নিয়ে যেতে। দেখি তার কত বড় সাহস—

আমার হঠাৎ মনে হল সত্যিই কেউ আমার কাছ থেকে টিপুকে নিয়ে যেতে পারবে না।

www.MurchOna.com

টিপু আস্তে আস্তে চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো ফিসফিস করে বলল, নীরা আপু সবাইকে নিয়ে এসেছে। লুসিফার আর ঢুকতে পারবে না। খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার শরীরে যেটা মাখানো হয়েছে সেটার ভিতরে কোনো একধরনের মাদকদ্রব্য আছে, সেটা লোমকূপ দিয়ে শরীরে ঢুকে তাকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলছে, তার শরীর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

বন্যা তীব্র চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী উচ্চারণ করতে করতে ধূপের মতো একটা জিনিস আগুনের মাঝে ছেড়ে দেয়। দপ করে একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বের হতে থাকে, ঝাঁঝালো গন্ধে হঠাৎ সারা ঘর ভরে যায়। বন্যা দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে উপরের দিকে তাকিয়ে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে কাকে যেন ডাকতে থাকে, আয় আয় আয় রে—আয় আয় আয় আয় রে—

একচক্ষু সোলায়মান বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে তালে তালে মাথা ঝাঁকাতে থাকে, আমি আতঙ্কের সাথে লক্ষ করলাম, তার হাতে একটা লম্বা রামদা। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, তালে তালে নাচতে থাকে, লাফাতে থাকে। টিপু হঠাৎ শক্ত করে আমার হাত ধরে চোখ খুলে ফিসফিস করে বলল, পারবে না, আসতে পারবে না—

কে আসতে পারবে না?

লুসিফার।

কেন?

আপনার জন্যে। আপনি ঠিক জিনিস করেছেন।

কী করেছি?

আপনি মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক জিনিস করেছেন। লুসিফার ব্যবহার করবে মাকে, আপু ব্যবহার করবে আপনাকে। আপু এখন চিৎকার করে সবাইকে ডাকছে, আর যত ভালো ভালো আত্মা আছে সবাই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াচ্ছে! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আত্মা। লুসিফার কিছু করতে পারবে না। কিছু করতে পারবে না।

টিপু লম্বা লম্বা নিশ্বাস নিতে থাকে, জ্বলজ্বলে চোখে তাকায়, তার মুখের কোণে আমি প্রথমবার একটু হাসি দেখতে পেলাম। আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, তোমার জন্যে আমি রসুন আর কঞ্চি পুড়িয়ে এনেছি।

সত্যি? কোথায়?

এই যে—আমি বের করে তার হাতে দিলাম। সে একটু রসুন মুখে পুরে কঞ্চির টুকরোটা শক্ত করে ধরে রাখল। আমি দেখতে পেলাম তার মনের জোর হঠাৎ করে একশো গুণ বেড়ে গেছে।

www.MurchOna.com

বন্যা বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করতে থাকে, তার সুগঠিত দেহ একধরনের আদিম হিংস্রতায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। সোলায়মান হাতে রামদা নিয়ে লাফাতে থাকে, আর হঠাৎ সারা ঘর থরথর করে কেঁপে ওঠে, মনে হয় সত্যিই বুঝি ঘরে কিছু-একটা এসেছে। যা ইচ্ছে হয় আসুক, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কেউ আমার হাত থেকে এই শিশুটিকে নিয়ে যেতে পারবে না। টিপুকে শক্ত করে ধরে আমি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি।

বন্যার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, সারা মুখে কষ্ট আর পরিশ্রমের একটা ছাপ, তার সাথে অবিশ্বাসের চিহ্ন। সত্যিই কি সে হেরে যাচ্ছে? সত্যিই কি হাজার হাজার আত্মা এসে ঘিরে রেখেছে আমাদের?

টিপু হঠাৎ আমাকে আঁকড়ে ধরে, বড় বড় করে নিশ্বাস নিয়ে ছটফট করে উঠে বলল, এখন এখন—

এখন কী?

শেষ করে দিন—

কী শেষ করে দেব?

লুসিফারকে।

লুসিফারকে?

হ্যাঁ।

কেমন করে?

হাত তুলে বলেন, বললেই হবে—বলেন—বলেন—

কী করতে হবে আমি জানি না, লুসিফার নামক জিনিসটি কোথায় তাও জানি না। তবু টিপুর কথামতো অনিশ্চিতভাবে হাত তুলে আমি বন্যার দিকে নির্দেশ করতেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, বন্যার মুখের কথা আটকে গেল, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বড় বড় নিশ্বাস নিতে থাকল। আমি আস্তে আস্তে বললাম, তুমি জন্মের মতো শেষ হয়ে গেছ বন্যা।

আর সাথে সাথে সত্যি সত্যি বন্যা হাঁটু ভেঙে নিচে পড়ে যায়। সত্যিই সে জন্মের মতো শেষ হয়ে গেছে?

সোলায়মান হাতে রামদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদেহী প্রেতাত্মার আক্রমণ হয়তো সহ্য করা যায়, কিন্তু এই দুর্বৃত্ত যদি রামদা নিয়ে ছুটে আসে? আমি সতর্ক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি—কিন্তু তার দরকার ছিল না—বন্যাকে দেখে সে রামদা নিচে ফেলে দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। শয়তানের উপাসনায় নিশ্চয় নানা স্তর আছে, ক্ষমতার প্রকারভেদ আছে। এই মুহূর্তে আমি সম্ভবত ক্ষমতার তুঙ্গে বসে আছি, অঙ্গুলিহেলনে হয়তো অর্ধ পৃথিবী ধূলিসাৎ করে দিতে পারি, আমার বিরাগভাজন হবে সে সাহস কার আছে?

এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। তারপর ভাগ্নের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, মামা—ও মামা—

www.MurchOna.com

দুই ঘণ্টা হয়নি, আগেই চলে এসেছে। উত্তর দেবার আগেই ভাগ্নে লাথি দিয়ে দরজার ছিটকিনি ভেঙে ঢুকে পড়ল। ধৈর্য নামক বস্তুটি তার শরীরে বিন্দুমাত্র নেই। কখনো ছিলও না।

মইনুল হাসানের গল্প এখানেই শেষ। জিজ্ঞেস করে আর যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি এরকম :

বন্যার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস কখনো তোলা হয়নি, কোনো প্রমাণ নেই, কেস দাঁড় করানো যায় না। জামাল সাহেবকে ছেড়ে সে আমেরিকায় চলে গেছে, শয়তানের উপাসনার জন্যে আমেরিকার উপরে নাকি দেশ নেই, খুনখারাপি সহ্য করে না সত্যি, কিন্তু প্রকাশ্যে শয়তানের উপাসনা করতে সেদেশে নাকি বাধা নেই। জামাল সাহেব সেই থেকে তাঁর ছেলে টিপুকে একা একা বড় করেছেন। টিপু এখন অনেক বড় হয়েছে, কলেজে যাবে। মইনুল হাসানের সাথে যোগাযোগ রেখেছে। মাঝে-মাঝেই দেখা করতে আসে।

সোলায়মানের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আছে নিশ্চয়ই কোথাও! হয়তো অন্য কোনো পিশাচিনী খুঁজে বের করেছে।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

রহমত চাচার এক রাত

আমরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেই রহমত চাচা আমাদের দেখতে আসতেন। লম্বা-চওড়া মানুষ, এই বয়সেও শরীর পাথরের মতো শক্ত। আমরা তখন ছোট, আমাদের দু-তিনজনকে এক হাতে টেনে তুলে ফেলতেন ঘাড়ের উপর। খাওয়ার সময় আমরা সবিস্ময়ে তাঁর খাওয়া দেখতাম—একজন মানুষ যে এত খেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। খাওয়া শেষ হবার পর হাত ধুয়ে উঠে পড়ছেন, তখন তাঁর থালায় কেউ প্রায় এক গামলা ভাত ঢেলে দিত, সাথে সমান পরিমাণ মাছ, মাংস বা শুধু ডাল। খানিকক্ষণ চ্যাঁচামেচি করে আবার খেতে শুরু করতেন, দেখতে দেখতে সব শেষ হয়ে যেত। তাঁর পেটে কোথায় যে এত জায়গা কে জানে! আমাদের খাওয়া দেখতেন আর মাথা নেড়ে বলতেন, এত কম খেয়ে থাকিস কেমন করে? কোনদিন তো বাতাসে উড়ে যাবি!

রহমত চাচার সবচেয়ে যেটা মজার সেটা হচ্ছে তাঁর গল্প বলার ঢং। পড়াশোনা জানেন না, জীবনে কোনো বই পড়েননি, তাই তাঁর সব গল্পই নিজের জীবনের সত্যি গল্প। এমন স্বাভাবিক গলার স্বরে এমন একটা অস্বাভাবিক গল্প বলে যেতেন যে শুনে আমরা হতবাক হয়ে যেতাম। যেমন : অমুক গ্রামের সব মানুষ চোর ছিল, মানুষেরা তাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশে খবর দিল। তখন ব্রিটিশের রাজত্ব, তারা এসে সবাইকে ধরে নিয়ে গেল, নেওয়ার সময় যদি কেউ পালিয়ে যায় তাই সবার হাতের তালু ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে সবাইকে একসাথে বেঁধে রেখেছিল। আমরা অবিশ্বাস করি কেমন করে, তাঁর নিজের চোখে দেখা! আরেকবার নারকেল নিয়ে কথা হচ্ছে, রহমত চাচা বললেন, কবে নাকি নারকেল গাছ থেকে নারকেল নামানো হয়েছে, নারকেল কেটে পানি গ্লাসে ঢালা হল, দেখা গেল পানির ভেতর কুচো চিংড়ি, পানির সাথে মিশে আছে, ভালো করে না দেখলে দেখা যায় না। তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনা—আমরা কী বলব?

www.MurchOna.com

সবচেয়ে মজার ছিল তাঁর ভূতের গল্পগুলি। যখন শুনেছি তখন অবশ্যি মজার মনে হয়নি, ভয়ে হাত-পা শরীরের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল। এজন্যে কখনো আমাদের সামনে ভূতের গল্প করতে চাইতেন না, ভূতের গল্প শুনে ভয় পেয়ে আমরা নাকি ভীতু হয়ে যাব। তাঁকে কিছুতেই বোঝানো যেত না যে ভয় পাওয়ার জন্যেই তো ভূতের গল্প শোনা, তা ছাড়া আমরা তো এমনিতেই ভীতু, নতুন করে ভীতু হবার প্রশ্ন কোথায়? যখন বড়রা বসে গল্প করত, কথায়-কথায় ভূতের গল্প উঠে যেত, তখন রহমত চাচা একটা-দুটো ভূতের গল্প বলতেন। ভয়ংকর সব গল্প, শুনে হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে চায়। তাঁর কাছ থেকে শোনা সবচেয়ে যেটা ভয়ের গল্প সেটা এরকম, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি।

সে অনেকদিন আগের কথা, আমার বয়স তখন মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ। সে-সময়ে আমাদের পাশের গাঁয়ে রশীদ মিয়া নামে একজন লোক থাকত। এরকম বদমায়েশ লোক আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। এমনিতে তার সুদের কারবার ছিল, কিন্তু এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যেটা সে করেনি। লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে তাদের জমি লিখে নেয়া থেকে শুরু করে কমবয়েসি মেয়েদের জোর করে বিয়ে করে ফেলা, কিছুতেই তার আপত্তি নেই। শুকনো দড়ির মতো চেহারা, থুতনিতে অল্পকিছু দাড়ি, মাথায় টুপি, মুখে সবসময় পান, কষ বেয়ে পানের পিক পড়ছে, দাঁতগুলি লাল। সেই রশীদ মিয়াকে এক রাতে কারা এসে খুন করে গেল। বাজার থেকে ফিরে আসছিল, বাড়ির কাছে বাঁশঝাড়, তার কাছে আসতেই লাঠির এক আঘাতে মাথা দুফাঁক। ধড়ফড় করতে করতে কিছুক্ষণের মাঝেই সে শেষ। মানুষ মারা গেলে খুশি হতে নেই, কিন্তু রশীদ মিয়া মারা গেলে তিন-চার গ্রামের অনেক মানুষ খুশি হয়েছিল।

পরদিন অনেক থানা-পুলিশ হল। সদর থেকে দারোগা নিজে এলেন, লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাগজপত্রে সবকিছু লিখে নিলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন রশীদ মিয়ার লাশ শহরে নিয়ে যেতে। খুনের মামলা—লাশ নাকি কেটে দেখতে হবে।

কে যাবে রশীদ মিয়ার লাশ নিয়ে? দুচোখের বিষ ছিল এলাকার সব লোকের, কারও এতটুকু গরজ নেই। গ্রামের মাতব্বরেরা তখন অনেক কষ্ট করে আমাদের কয়েকজনকে রাজি করালেন। জোয়ান বয়স তখন, ভাবলাম, কী আছে, নিয়ে যাই লাশটাকে। মরে যখন গেছে রাগ পুষে আর কী হবে? দুজন বলল, তারা যেতে পারে কিন্তু লাশ পৌঁছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, বাড়িতে জরুরি কাজ। মাতব্বরেরা তাতেই রাজি, গরমের দিন লাশ বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যায় না।

আমরা চারজন আর গ্রামের মাতব্বর, মোট পাঁচজন রওনা দিলাম শহরে। শুকনো টিংটিঙে রশীদ মিয়ার শরীর, কিন্তু কী ওজন, জান বের হয়ে গেল চারজন

www.MurchOna.com

জোয়ান মানুষের! আমাদের মাঝে আফজালের বয়স কম, ভয় বেশি, একটু পরেপরে বলল, লাশ এত ভারী কেন? তেনারা ভর করেছেন নাকি? 'তেনারা' কি না জানি না, কিন্তু চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁশের সাথে বেঁধে লাশ আনতে আনতে আমাদের কালঘাম ছুটে গেল!

নদীর একদিকে শহর, অন্যদিকে লাশকাটা ঘর। আশেপাশে ধানিজমি, মাঝখানে ছোট একটা লাল রঙের ঘর। চারপাশে বুনো জঙ্গল ঘরটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। দরজায় তালা মারা ছিল, কিন্তু পুরানো জং-ধরা তালা ধাক্কা দিতেই নিজে থেকে খুলে গেল। ভিতরে উঁচু টেবিল, কংক্রিট দিয়ে লাশকাটা ঘরের সাথে পাকাপাকিভাবে তৈরি করা হয়েছে। টেবিলের উপর রশীদ মিয়াকে রেখে আমরা বের হয়ে এলাম, ভিতরে কী বোটকা গন্ধ!

বাইরে এসে দেখি কিছু কুকুর। অদ্ভুত কুকুর সেগুলি, লাশকাটা ঘরের আশেপাশে থাকে, মানুষকে ভয় পায় না। বেওয়ারিশ লাশ নিশ্চয়ই জানাজা না পড়িয়েই আশেপাশে পুঁতে ফেলে। দেখলাম, কুকুরগুলি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে হাড়গোড় বের করছে। আমাদের দেখে সরে গেল না, উলটো আমাদের চোখের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রইল, ভাবখানা এই—লাশগুলি হেঁটে বেড়াচ্ছে কেমন করে? দেখে কেমন জানি ভয় লাগে।

যে-দুজনের ফিরে যাবার কথা তারা একটু বিশ্রাম নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিয়ে দিল, বেশি রাত হবার আগেই তারা গ্রামে পৌছাতে চায়। আমরা বাকি তিনজন অপেক্ষা করছি, কিন্তু লাশ কাটার জন্যে ডাক্তার বা অন্য কেউই আসে না। আবার রাত হয়ে গেলে মুশকিল, তাই আমাদের মাতবর ঠিক করলেন থানায় গিয়ে খোঁজ নেবেন। একা যেতে ভরসা পান না, গ্রামের মানুষ শহরে গেলে মানুষের ভিড়ে তাল হারিয়ে ফেলেন, সাথে আরেকজনকে নিয়ে যেতে হয়। আফজাল কখনো শহর দেখেনি, আমি তাকে বললাম সাথে যেতে, শহরটা দেখে আসুক। মরা একটা লাশ তো পালিয়ে যাবে না, একজন থাকলেই হয়। ঐ বাজে কুকুরগুলি না থাকলে পাহারা দেবারও দরকার ছিল না। আফজাল আমাকে একা রেখে যেতে ইতস্তত করছিল, জায়গাটা নাকি ভালো নয়। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম, পরিষ্কার দিনের বেলা, চারপাশে ধানের খেতে চাষীরা কাজ করছে—ভয়ের কী আছে?

ওরা চলে গেলে আমি একা একটু দূরে বসে রইলাম, মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে লাশকাটা ঘরটাকে দেখি। কুকুরগুলি ঘুরঘুর করছে, গোঁগোঁ করে চাপাস্বরে নিজেদের ভিতর ঝগড়া করে, মাঝে মাঝে মাটি থেকে খুঁড়ে তুলে কী যেন কচমচ করে খায়, ভারি অস্বস্তি লাগে মনে। কথা ছিল ওরা ঘণ্টাখানেকের মাঝে ফিরে আসবে, কিন্তু বেলা পড়ে এল, তবু তো কেউ আসে না! আমি পড়েছি মুশকিলে, না পারি যেতে না পারি থাকতে। চাষীরা সবাই বাড়ি ফিরে

যেতে শুরু করে। দুএকজন কৌতূহলী মানুষ আমার সাথে কথাবার্তা বলল, রশীদ মিয়া কে, বাড়ি কোথায়, কীভাবে খুন হল সব বৃত্তান্ত খুলে বলতে হল। লশটাকে দেখতে চাইলে আমি ভিতরে নিয়ে চাটাই খুলে দেখালাম। মানুষের এই একটা জিনিস বড় আশ্চর্য, একটা মরা মানুষ না দেখে কিছুতেই যাবে না। মরে যাবার পর রশীদ মিয়ার চোখ কেউ বন্ধ করে দেয়নি, তাই চোখ খোলা, উপরের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে। মুখটা অল্প হাঁ করা, ময়লা হলুদ দাঁত বের হয়ে আছে, দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। চাষীরা আমাকে বলল লাশকাটা ঘরের দরজাটা দড়ি দিয়ে বেঁধে চলে যেতে। সন্ধে হয়ে আসছে, আজ আর কেউ আসবে না। আর এই জায়গাটা নাকি বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ, মানুষজন নাকি দিনদুপুরেই ভয় পায়। রাতে নাকি বিরাট বিরাট সাদা রঙের কুকুর ঘোরাঘুরি করে এখানে, কোথা থেকে আসে কোথায় যায় কেউ জানে না। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের গ্রামের মাতবর খুব দায়িত্বশীল মানুষ, আমি জানি তিনি আফজালকে নিয়ে ফিরে আসবেনই। একা আমাকে এখানে রেখে গেছেন সেটা তাদের খুব ভালো মনে আছে, ফিরে এসে আমাকে না দেখলে আবার উলটো ঝামেলা হয়ে যাবে। ভূতের ভয় আমার নেই, আমি ঠিক করলাম আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, এর মাঝে তারা যদি না আসে কিছু-একটা করা যাবে।

আমি একা বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছি আর রশীদ মিয়াকে গালি দিচ্ছি, শালা বেঁচে থাকতে তো জ্বালিয়েছেই, মরেও জ্বালিয়ে গেল। কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ শুনি শোঁশোঁ বাতাসের শব্দ। অন্ধকারে বুঝতে পারিনি কখন আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলেছে, প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। দেখতে দেখতে ভীষণ ঝড় শুরু হল, পারলে আমাকে প্রায় উড়িয়েই নেয় বাতাসে। একটু পর বাতাসের সাথে শুরু হল বৃষ্টি, দেখতে দেখতে আমি ভিজে একেবারে চুপসে গেলাম, ঠাণ্ডাও লাগছে প্রচণ্ড। ভাবলাম অনেক হয়েছে আর নয়, এখন পালাই। ঝড়ের মাঝে যাব কোথায় তাও জানি না। যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন হঠাৎ শুনি গলার আওয়াজ। ঝড়ের মাঝে বোঝা যায় না, কিন্তু মনে হল মাতবরের গলার স্বর। আমিও চেঁচিয়ে ডাকলাম তাদের, তারাও উত্তর দিল আমি স্পষ্ট শুনলাম। আমার বুকে তখন সাহস ফিরে এল, সবাই ফিরে আসছে তা হলে। প্রচণ্ড বৃষ্টি তখন, ভাবলাম বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজে কী লাভ, লাশকাটা ঘরের ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করি, মাথার উপর অন্তত একটা ছাদ তো আছে!

আমি লাশকাটা ঘরে ঢুকছি, হঠাৎ কেন জানি মনে হল কাজটা ভালো হচ্ছে না, কে জানি মনের ভিতরে বলে উঠল, খবরদার! যাসনে, ভিতরে বিপদ হবে। কেমন জানি শিরশির করে উঠল আমার শরীর। কিন্তু তখন জোয়ান বয়স, বুদ্ধি কম, সাহস বেশি। ভাবলাম, আরে ধুর! আমার ভয়টা কিসের, ঐ তো সবাই এক্ষুনি এসে যাবে। আমি ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, ভীষণ বৃষ্টি

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

আসছিল। আড়চোখে তাকিয়ে রশীদ মিয়ার লাশটাকে একবার দেখলাম। এমনিতে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, বিদ্যুৎ চমকালে দেখা যায় রশীদ মিয়ার লাশ একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে পড়ে আছে।

ভিজে কাপড় খুলে নিংড়িয়ে মাথাটা মুছে একটু আরাম হল, বাইরে তখনও বৃষ্টি। লাশটার দিকে পিছন দিয়ে দরজার কাছে বসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু ওরা তো আর আসে না! একটু একটু করে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল, কিন্তু ওদের তো আর দেখা নেই! আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, ওটা নিশির ডাক ছিল, সাথে সাথে ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মানুষ বেশি ভয় পেলে কিছু করতে পারে না, চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনা কমে আসে। আমি নড়তে সাহস পাই না, দরজা খুলে বাইরে যাবার শক্তি নেই, মনে হয় দাঁড়ালেই পিছন থেকে রশীদ মিয়া লাফিয়ে পড়বে আমার উপর। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম, বোঝালাম, কিছু নয়, রশীদ মিয়া মরে গেছে, মরা মানুষ কী করবে? বৃষ্টিটা একটু কমলে বের হয়ে শহরের দিকে যাব, আজ অনেক হয়েছে, আর নয়। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ মনে হল পিছনে কী-একটা শব্দ হল, চাটাইয়ে শুয়ে-থাকা রশীদ মিয়া নড়ে উঠলে যেরকম শব্দ হবে সেরকম। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ভয়ে, কিন্তু নিজেকে বোঝালাম ইঁদুর হবে নিশ্চয়ই। বৃষ্টিটা তখন কমে আসছে, আরেকটু কমলেই বের হয়ে যাব।

আমি এখন বুঝতে পারি আমার উপর কিছু-একটা ভর করেছিল সে-রাতে, বিচারবুদ্ধি কমে গিয়েছিল কোনো কারণে। প্রথমে এভাবে একা ওরকম একটা জায়গায় ঢোকা আমার মোটেও উচিত হয়নি। তা ছাড়া যখন বুঝতে পেরেছিলাম ওদের গলার স্বর আসলে ভুল শুনেছি, তখন-তখনই আমার বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আমি ভিতরে বসে আছি। হঠাৎ মনে হল বাইরে কী-একটা যেন ছুটে গেল। আমি চমকে উঠি, কিন্তু চমকে উঠে বসেই থাকি, আরকিছু করি না। বাইরে তাকাতে ভয় হয়—তাই দরজাও আর খুলি না। কাঠ হয়ে বসে আছি, হঠাৎ আবার স্পষ্ট শুনলাম টেবিলে চাটাইয়ের উপর রশীদ মিয়ার শরীর বেশ ভালোভাবে নড়েচড়ে উঠল। ভয়ে আমার শরীরের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। ইঁদুরের শব্দ এটা নয়, ইঁদুর এত জোরে শব্দ করতে পারে না। পিছনে তাকানোর সাহস নেই, যদি কিছু-একটা দেখি!

বৃষ্টি কমে এসে তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আকাশে বেশ বড় একটা চাঁদ, লাশকাটা ঘরের উপরে ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে আলো এসে পড়েছে। মাঝে-মাঝেই চাঁদ মেঘে ঢেকে যায় আবার মেঘ থেকে বের হয়ে আসে, আমি বসে বসে তা-ই দেখছি। কতক্ষণ এভাবে বসে ছিলাম জানি না, মনে হয় কয়েক যুগ। বাইরে তখন ছোটাছুটির শব্দটা ভীষণ বেড়েছে। কুকুর শেয়াল কিছু-একটা এদিক থেকে সেদিক, সেদিক থেকে এদিক ক্রমাগত ছোটাছুটি করছে। আমি

www.MurchOna.com

দেখি আর পারি না, নড়তেচড়তে ভয় হয়, শুধু মনে হয় পিছন থেকে কিছু-একটা আমার উপর লাফিয়ে পড়বে। তবু খুব সাহস করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম আর সাথে সাথে আমার স্পষ্ট মনে হল চাটাই থেকে রশীদ মিয়া উঠে বসল। অসম্ভব ভয় পেলাম আমি, চ-ন-ন-ন করে মাথায় রক্ত উঠে গিয়ে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা কী-একটা বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা কে যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে, যতই ধাক্কা দিই দরজা আর খোলে না। পাগলের মতো লাথি দিচ্ছি দরজায়। আর তখন হঠাৎ মনে পড়ল যে, দরজাটা ভিতর দিয়ে খোলে। ভয়ে তখন ঘেমে গেছি। আমি একটানে দরজা খুলে ফেললাম, এক দৌড় দেব, কিন্তু সামনে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

এইটুকু বলে রহমত চাচা একটু থামলেন, তাঁর নিশ্চয়ই পুরো দৃশ্যটা মনে পড়ে গেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে খানিকক্ষণ একপাশে তাকিয়ে থেকে আবার শুরু করলেন—সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি লাশকাটা ঘর ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে কুকুরের মতো কতগুলো প্রাণী। দেখতে কুকুরের মতো হলেও কুকুর থেকে অনেক বড়, চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে, গায়ের রং ধবধবে সাদা। আমাকে দেখে সবগুলি নড়েচড়ে বসে, চাপাস্বরে ডাকে, কেমন যেন হিংস্র ভাবভঙ্গি, যেন সবগুলি একসাথে লাফিয়ে পড়বে আমার উপর। আমি আতঙ্কে পাগলের মতো হয়ে আবার ভিতরে ঢুকব, তখন তাকিয়ে দেখি রশীদ মিয়া দুহাতে টেবিলটা ধরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মুখে কেমন একটা ধূর্ত হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্থির, পাথরের মতো, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে আমার ভিতর দিয়ে যেন দেখছে।

মানুষ বেশি ভয় পেলে সব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। আমার শুধু মনে হতে লাগল এক্ষুনি গিয়ে রশীদ মিয়াকে চেপে শুইয়ে দিতে হবে। কেন আমার সেরকম মনে হচ্ছিল এখনও আমি জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল ও মরা মানুষ, ওর বসে থাকার কথা না, ওর বসে থাকা সাংঘাতিক একটা সর্বনাশের ব্যাপার। নিশ্চয়ই পাগলটাগল হয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি সত্যি যখন ভিতরে ঢুকছি তখন হঠাৎ শুনি প্রচণ্ড এক ধমক, কে? কে ওখানে?

মুহূর্তে আমার জ্ঞান ফিরে এল। ভাবলাম, সর্বনাশ, আমি এ কী করতে যাচ্ছি! তাড়াতাড়ি ঘুরে বাইরে তাকিয়ে দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। মনে হল বয়স্ক, লম্বা-চওড়া, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি। আমাকে তাকাতে দেখে আবার প্রচণ্ড জোরে একটা ধমক দিল, কী করছ ওখানে? বের হয়ে এসো এক্ষুনি, এক্ষুনি বের হয়ে এসো।

ভয়ে তখন আমার সারা শরীর কুলকুল করে ঘামছে, আমি কোনোমতে টলতে টলতে বের হয়ে এলাম। রশীদ মিয়ার লাশ দেখিয়ে কিছু-একটা বলতে যাব, লোকটা আবার ধমকে উঠল, খবরদার, পিছনে তাকাবে না, সোজা বের হয়ে এসো।

www.MurchOna.com

আমি লাশকাটা ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। কুকুরের মতো জন্তুগুলি কেন জানি অনেক পিছনে সরে গেছে, সেখান থেকেই চাপাস্বরে গোঁগোঁ করছে। আমি লোকটার দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম, লোকটা আবার ধমকে উঠল, এদিকে না, তুমি সোজা সামনের দিকে হাঁটো।

আমার নিজের উপর তখন কোনো জোর নেই, লোকটার কথামতো টলতে টলতে হাঁটতে থাকি। পিছন থেকে লোকটা বলল, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটো, খবরদার, পিছনে তাকাবে না।

আমি আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে থাকি, খানিকক্ষণ পর কী-একটা বলতে যাব, লোকটা বলল, কোনো কথা নয়, সোজা সামনের দিকে হাঁটো।

আমার হঠাৎ খটকা লাগল, লোকটা বুঝল কেমন করে আমি কথা বলব? তা ছাড়া এত বৃষ্টি হয়ে চারদিকে কাদাপানি হয়ে আছে, আমি ছপছপ করে হাঁটছি, লোকটার হাঁটায় কোনো শব্দ নেই কেন? ঘুরে পিছন দিকে তাকাব, লোকটা তখন আবার প্রচণ্ড ধমক দিল, খবরদার, পিছনে তাকাবে না।

আমার কী হল জানি না, তবু আমি পিছনে তাকালাম। তাকিয়েই বুঝলাম কেন সে পিছনে তাকাতে নিষেধ করেছে। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় পিছনের লোকটা আসলে মানুষ নয়, চেষ্টা করছে মানুষের মতো রূপ নিতে। অন্তত দশ ফুট উঁচু—কালো, নাক-মুখ-চোখ আছে, কিন্তু যেরকমভাবে থাকার কথা সেরকমভাবে নেই, অন্যভাবে আছে। আমি তাকাতেই জিনিসটা অদ্ভুত একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। দেখলাম ওর চোখ-নাক-মুখ নড়তে থাকে, যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেগুলিকে আটকে রাখতে, যেন খুলে আসবে হঠাৎ করে ...

এরপর আমার আরকিছু মনে নেই।

পরে আফজালদের কাছে শুনেছি আমাকে ওরা যখন পেয়েছে তখন আমি নাকি পাগলের মতো ছুটছি, ওরা যেদিক দিয়ে আসছিল সেদিকেই। ওরা দুজন মিলে নাকি ধরে রাখতে পারে না, সারা শরীর থেকে নাকি তেলতেলে পিছল কী-একটা জিনিস বের হচ্ছে। যখন জোর করে ধরে কিল-ঘুষি মেরে আমাকে ধাতস্থ করল, আমি নাকি বিড়বিড় করে কী-একটা কথা বলে জ্ঞান হারালাম। ওরা শুধু রশীদ মিয়ার লাশ কথাটা বুঝতে পারল। থানার লোকজনের খামখেয়ালিপনার জন্যে ওদের দেরি হয়েছিল, তাড়াহুড়ো করে যখন নদীর ঘাটে এসেছে, তখন ঝড়ের জন্যে খেয়া বন্ধ। ঝড় কমে যাওয়ার পরেও কাউকে পাওয়া যায় না, অনেক কষ্ট করে একজনকে রাজি করিয়ে ওরা নদী পার হয়েছে। আমাকে ধরাধরি করে ওরা পাশের গ্রামে নিয়ে গেল, সেখান থেকে পরের দিন বাড়িতে।

রহমত চাচা থামতেই কে-একজন জিজ্ঞেস করল, রশীদ মিয়ার লাশের কী হল?

লাশকাটা ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল, কুকুর-শেয়াল টেনে নামিয়েছে হয়তো। কে জানে! রহমত চাচা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমাকে আসলে

www.MurchOna.com

সে-রাতেই মেরে ফেলত, লোকজন ঠিকই বলেছিল, জায়গাটার দোষ আছে। আমি মরেই যেতাম, জিনটা বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, জিন? আপনি বুঝতে পারলেন কেমন করে সেটা জিন?

রহমত চাচা বললেন, তখন বয়স কম ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই বুঝতে পারিনি, এখন বুঝি।

কীভাবে বোঝেন? আর কখনো জিন দেখেছেন?

রহমত চাচা হঠাৎ উঠে পড়েন, ধমক দিয়ে বলেন, যাও যাও, ঘুমাও গিয়ে, বাচ্চা ছেলেরা কেন জিন-ভূতের গল্প শুনতে চাও?

আমরা তবু বসেই থাকি, ওঠার সাহস অনেক আগেই চলে গেছে। দিনের আলো দেখার আগে কোনো ওঠাউঠি নেই।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

সহযাত্রী

প্লেনে আমার পাশে যে-লোকটা বসেছে তার মুখে একটা কাটা দাগ। দীর্ঘদিন থেকে বিদেশে আছি, তাই লোক-দেখানো ভদ্রতাগুলি বেশ শিখে গেছি। জিজ্ঞেস করার জন্য মুখটা সুড়সুড় করছে, তবু কেমন করে এত খারাপভাবে মুখটা কাটল জিজ্ঞেস করছি না। প্লেনটা আকাশে ওঠামাত্র লোকটি এয়ার-হোস্টেসের কাছ থেকে চেয়ে ছোট ছোট বোতলে মদ নিয়ে নিল। ভদ্রলোকেরা অবশ্যি মদকে মদ বলে না, যেটার যে-নাম সে-নামে ডাকে, কোনোটা বিয়ার, কোনোটা ওয়াইন, কোনোটা হুইস্কি। যারা জিনিসটা খায়, তারা তো এখনও মদ কথাটিকেই রীতিমতো অপমানজনক মনে করে। আমি এখনও দেশি মানুষ, জিনিসটা কখনো খাইনি। তাই বিভিন্ন মদের সূক্ষ্ম পার্থক্য এখনও ধরতে পারিনি, সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি এবং সবগুলিকে এককথায় মদ বলে ডাকি। তা ছাড়া এই জিনিসটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না, বিশেষ করে প্লেনে। একবার প্লেনের সীট নিয়ে কী-একটা গোলমাল হবার পর আমাদের কয়েকজনকে ফার্স্ট ক্লাসে তুলে দিল। ফার্স্ট ক্লাসে বিনি পয়সায় মদ খেতে দেয়। আমার পাশে যে বসেছিল বিনে পয়সার মদের লোভ সামলাতে না পেরে একের পর এক গ্লাস মদ খেতে থাকে। ঘণ্টা দুয়েক পর সেই ব্যাটা মদের কল্যাণে কথা নেই বার্তা নেই ওয়াক করে আমার উপর বমি করে দিল। নিজের বমিতেই মানুষের ঘেন্নায় মরে যাবার মতো অবস্থা হয়, অন্যের বমির কথা তো ছেড়েই দিলাম, তার উপর যদি ভোজনবিলাসী মানুষের বমি হয়!

যাই হোক, এবারেও লোকটাকে ছোট ছোট বোতল খেতে দেখে আমি সাবধান হয়ে গেলাম। মদ একেকজন মানুষকে একেকভাবে পালটে দেয়। এই গোমড়ামুখী মানুষটিকে মনে হল হাসিখুশি করে দিল। প্রথম বোতলটা খেয়েই আমার দিকে দাঁত বের করে হাসল, বলল, প্লেনে উঠতে আমার দারুণ ভয়।

আমি একটু অবাক হলাম। আমার ধারণা ছিল, প্লেনে উঠতে ভয় পায় আমার মতো একেবারে দেশজ বাঙালি মানুষ, এই সহযাত্রীর মতো হাট্টাকাট্টা

www.MurchOna.com

বিদেশি মানুষ বুঝি এসবকে ভয়ডর পায় না। একটু হেসে বললাম, আমারও প্লেনে ভয় করে।

লোকটা এবারে একটু গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, না না না, আমি যত ভয় পাই, আর কেউ তত ভয় পায় না। সেজন্যে প্লেনে আমি উঠতেই চাই না। উঠলেই আমাকে ড্রিংক করতে হয়। বেশি করে খানিকটা ড্রিংক করে নিলে মাথাটা হালকা হয়, ভয় কমে আসে।

আমি একটা জ্ঞানগম্ভীর মন্তব্য করার চেষ্টা করলাম, বললাম, হ্যাঁ, উচ্চতার ভীতির একটা নাম আছে, বলে এক্রোফোবিয়া—

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, না না, এটা এক্রোফোবিয়া না। এটা হয়েছে কয়েক বছর আগে। আমি একবার—

লোকটা হঠাৎ থেমে গেল, ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ হাতের ছোট বোতলটার দিকে তাকিয়ে কোঁত করে পুরোটা একেবারে গিলে ফেলল। আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, একবার কী হয়েছিল?

আমি প্লেনে যাচ্ছিলাম। প্লেনটা ক্র্যাশ করে গিয়েছিল।

কী সর্বনাশ! আমি ভালো করে লোকটার দিকে তাকালাম—বলছে কী এই লোক!

হ্যাঁ। ভয়ংকর ব্যাপার। এই যে কাটা দাগ দেখছ গালে, সেটা তখনই হয়েছে। লোকটা বেশ আদর করে গালের কাটা দাগটায় একবার হাত বোলাল।

কীভাবে ক্র্যাশ করল? লোকজন কি মারা-টারা গিয়েছিল কেউ?

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে একটু অদ্ভুতভাবে হাসল। তারপর বলল, একশো ঊনাশি জন মানুষ মারা গিয়েছিল।

একশো ঊনাশি! কী সর্বনাশ! আমার সারা গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের এই প্লেনেও তো মনে হয় প্রায় সেরকম মানুষই আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কয়জন ছিল প্লেনে?

লোকটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, একশো আশি।

আমি চমকে উঠে বললাম, মানে শুধু তু-তুমি?

হুঁ। লোকটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, আমি লক্ষ করলাম তার শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। খানিকক্ষণ পর সে আমার দিকে তাকাল, আমি দেখলাম তার চোখ অল্প অল্প লাল। কে জানে মদের কেরামতি কি না।

লোকটা আরেকটা ছোট মদের বোতলের ছিপি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে খুলতে বলল, আমি সেই ঘটনার কথা মনে করতে চাই না। একটা ভয়ংকর বিভীষিকার মতো ব্যাপার।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, আমি খুব দুঃখিত, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইনি। আমি খুব দুঃখিত—

www.MurchOna.com

তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমিই তো শুরু করেছি।

শুরু করেছ বলেই যে তোমাকে এটা নিয়ে কথা বলতে হবে সেটা কে বলেছে! অন্যকিছু নিয়ে কথা বলা যাক। কতদূর যাচ্ছ তুমি?

লোকটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, ঘটনাটা মাথা থেকে সরানো কঠিন। মনে হয় তোমাকে যদি খুলে বলি, হয়তো বুকটা হালকা হবে। বলব?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, বলো। প্লেনে বসে প্লেন ক্র্যাশের গল্প শুনতে ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু এরকম গল্প আমি কোথায় পাব?

শোনো তা হলে। লোকটা একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে শুরু করে।

আমি তখন মোটরগাড়ি কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটিটিভ। কাজের জন্যে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়। বিয়েটিয়ে করিনি, ঘরে স্ত্রী-পুত্র নেই, ঘোরাঘুরিতে সময় কাটাতে খারাপ লাগে না।

অফিসের কাজে একবার গিয়েছি ভ্যানকুবার কানাডায়—ছবির মতো শহর। বরফে-ঢাকা পাহাড়, নীল হ্রদ, সবুজ পাইনগাছের সারি দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। একদিন থাকার কথা, তিনদিন থেকে গেলাম।

তিনদিন পর ফিরে আসব, ভ্যানকুবার থেকে প্লেনে উঠেছি, সিয়াটল হয়ে যাব টাম্পা, ফ্লোরিডা। ওয়েস্টার্ন ফ্লাইট নাম্বার তিনশো এগারো। প্লেনটা ভ্যানকুবার ছেড়েছে বিকেল পাঁচটায়, সিয়াটল পৌঁছেছে সাড়ে পাঁচটায়। যাত্রী ওঠানামা করিয়ে আবার যখন ছাড়ল, তখন ছয়টা বেজে গেছে। সিয়াটলে খুব বৃষ্টি হয়, যখন প্লেন ছেড়েছে তখন আকাশজোড়া মেঘ, অন্ধকার, থমথমে ভাব। প্লেনটা মেঘ কেটে উপরে উঠতেই দেখা গেল ঝকঝকে আলো, বিকেলের রোদ বেশ জানালা দিয়ে ভিতরে আসছে।

ঘণ্টাখানেক পেরিয়েছে, তখন হঠাৎ করে প্লেনের একটি ইঞ্জিন থেমে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা ঘুরে যাচ্ছিল, পাইলট সামলে নিল। উপর থেকে জিনিসপত্র পড়ে ভিতরে একেবারে হৈচৈ আতঙ্ক। পাইলট অভয় দিয়ে বলল, যান্ত্রিক গোলযোগ, একটা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ বোয়িং ৭২৭ একটি ইঞ্জিনেই অনির্দিষ্ট সময় নিরাপদে যেতে পারে। তবুও সে কোনো ঝুঁকি নেবে না। কাছেই স্পোকেন এয়ারপোর্টে নেমে যাচ্ছে। এখান থেকে বড়জোর পনেরো মিনিটের পথ। আমরা সবাই সীটবেল্ট লাগিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

এর পর দুমিনিটও যায়নি, হঠাৎ করে প্লেনের গর্জন থেমে গেল, দ্বিতীয় ইঞ্জিনটিও গিয়েছে। নিঃশব্দ একটি প্লেন থেকে ভয়ংকর কিছু হতে পারে না। আমরা টের পাচ্ছি একটা মাটির ঢেলার মতো প্লেনটা নিচে নেমে যাচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে সবার। ভয়াবহ একটা আতঙ্ক, তার মাঝে শুনলাম—পাইলট বলল, ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করছি আমরা। হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসে থাকো সবাই।

www.MurchOna.com

বোয়িং সেভেন টুয়েন্টি সেভেন চমৎকার প্লেন, কোনো ইঞ্জিন ছাড়াই চমৎকার ভেসে যেতে পারে বেশ অনেকদূর। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, ল্যান্ড করার জন্যে সমতল জায়গা দরকার, প্লেনের দিক্‌পরিবর্তনের জন্যে হাইড্রোলিক সিস্টেম দরকার। এসব কিছু ছাড়া প্লেন ল্যান্ড করার চেষ্টার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আমি জানালা দিয়ে তাকালাম, নিচে সুবিস্তীর্ণ ক্যাসকেড মাউনটেনস, শেষবিকেলের আলো পড়ে বরফ চিকচিক করছে। তার মাঝে প্রায় দুইশো মানুষ নিয়ে একটি প্লেন নিঃশব্দে মাটির দিকে ছুটে যাচ্ছে। প্লেনে একটি শব্দ নেই, প্রতিটি মানুষ নিশ্বাস বন্ধ করে আছে।

লোকটা এই জায়গায় এসে একটু থামল, বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিল। আমি আড়চোখে লেবেলটি পড়ে দেখলাম, জিনিসটা হুইস্কি, যতদূর জানি এটা একটা কড়া মদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছিল প্লেনে?

জ্বালানি তেল নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। কানাডায় ম্যাট্রিক সিস্টেম, আমেরিকায় ব্রিটিশ সিস্টেম। প্লেনে তেল ভরার সময় দুই সিস্টেম নিয়ে গোলমাল করে যেটুকু ভরার কথা তার থেকে অনেক কম তেল ভরেছিল।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কী হল তারপর?

সেই মুহূর্তগুলির কথা আমি বলতে পারব না। বলা সম্ভবও না। একেবারে শেষ মুহূর্তে, প্লেনটা একটা পাহাড়ে ধসে পড়ার আগের মুহূর্তে শুনলাম একটা মেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল প্লেনটা, কানে তালা-লাগানো একটা শব্দ, এরপর আরকিছু মনে নেই।

আমার যখন জ্ঞান হল, আমি দেখলাম একটা পাইনগাছ থেকে আমি উলটোভাবে ঝুলছি। প্লেনের পুরো সীটে আমি তখনও বাঁধা। আমার শরীর কেটে-ছড়ে গেছে। কিন্তু আঘাত নেই। আমি তখন একটা ঘোরের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে কীভাবে কীভাবে জানি গাছ থেকে নেমে এলাম। আচ্ছন্নের মতো বরফের মাঝে ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। আমি যে বেঁচে আছি সেটাও ভালো করে বুঝতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে আছি কি নেই, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল না।

ক্যাসকেড পাহাড়ের উপর ভয়ানক ঠাণ্ডা, কিন্তু আমার সেরকম ঠাণ্ডাও লাগছিল না। খানিকক্ষণ ইতস্তত হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ করে প্লেনটা আবিষ্কার করলাম। পাহাড়ের একটা ঢালুতে ফিউসলেজটা পড়ে আছে, ঠিক মাঝখানে ভেঙে দুই টুকরো। আমি এই ভাঙা অংশ দিয়ে ছিটকে বের হয়ে এসে বেঁচে গেছি। প্লেনের পাখা দুটি নেই, ভেঙে অন্য কোথাও পড়ে আছে। প্রথমে

www.MurchOna.com

মনে হল হয়তো আরও অনেকে বেঁচে আছে। কাছে চিৎকার করে ডাকলাম বারদুয়েক। নিজের কানেই ভারি আশ্চর্য শোনাল সেই ডাক, কেমন যেন অতিমানবিক। কেউ কোনো উত্তর দিল না। পাহাড়ের উপর গোধূলি বেলায় একটা আশ্চর্য রকমের নীরবতা। আমি হঠাৎ করে টের পেলাম আমার শীত করছে।

পাহাড়ে সূর্য ডোবার পর খুব দ্রুত তাপমাত্রা নেমে যায়। এই ঠাণ্ডায় মানুষের হাইপোথার্মিয়া হয়ে যেতে পারে। হাইপোথার্মিয়া হলে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়। তখন মানুষ ঠিক করে চিন্তা করতে পারে না। আমার মনে হল আমার হয়তো হাইপোথার্মিয়া শুরু হয়ে গেছে। ভাসা-ভাসাভাবে মনে হল গায়ে কোনো গরম কাপড় নেই, কিছু গরম কাপড় দরকার। গরম কাপড় কোথায় পাই, কিছুতেই চিন্তা করে বের করতে পারছিলাম না, হঠাৎ করে মনে হল প্লেনের ভিতরে নিশ্চয়ই আছে। তখন ঠিক করলাম ভিতরে গিয়ে ঢুকি।

প্লেনের শরীরটা, যাকে ফিউসলেজ বলে, সেটা কাত হয়ে পড়ে আছে। দরজা শক্ত করে বন্ধ। টেনে খোলা গেল না। তখন ফিউসলেজের মাঝখানে ভাঙা অংশটুকু দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে কোনোমতে ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে আবছা অন্ধকার, বেশ দেখা যায়। চারদিকে ধবধবে সাদা বরফ থাকলে কখনোই ঘুটঘুটে অন্ধকার হয় না। আমি ভিতরে ঢুকে কিছু গরম কাপড় খুঁজতে লাগলাম।

উপরে কম্বল রাখা থাকে। প্রচণ্ড আঘাতে ভিতরে সবকিছু ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কোনটা উপরে কোনটা নিচে কিছু বোঝার উপায় নেই। তার মাঝে সারি সারি মৃতদেহ স্থির হয়ে পড়ে আছে। আমি আবছা অন্ধকারে হাতড়াতে থাকি, কিন্তু কোনো লাভ হল না, কোনো কম্বল খুঁজে পেলাম না। আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম, হঠাৎ করে মনে হল এই লোকগুলি তো মরে গেছে, ওদের তো আর কাপড়ের দরকার নেই। ওদের গা থেকে খুলে নিই না কেন?

কাজটা সহজ নয়—আমি আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই না। খানিকক্ষণ আগেও এই মানুষগুলির জীবন ছিল, এখন নেই—এই ধরনের কোনোরকম দার্শনিক চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। আমার গরম কাপড় দরকার, যেভাবে সম্ভব এদের গা থেকে কাপড় খুলে নিতে হবে—এরকম একটা অন্ধ গোঁ ভিতরে কাজ করছিল। যতই অসুবিধে হচ্ছিল, ততই আমি এই মৃত মানুষগুলির উপর খেপে উঠছিলাম। কতক্ষণ লেগেছিল জানি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কয়েকটা কোট খুলে নিতে পারলাম। প্রথমে একটা দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নিলাম। যত ঠাণ্ডাই হোক, মানুষের শরীর কখনো মাথায় রক্তসঞ্চালন বন্ধ করে না, তাই বেশি ঠাণ্ডায় মাথা খোলা থাকলে শরীরের তাপ খুব দ্রুত বের হয়ে যায়।

শরীরটা একটু ঢেকে নেওয়ার পর মনে হল ভিতরে থাকি। কিন্তু একটু পর কেমন জানি ভয় লাগতে শুরু করল, অকারণ অর্থহীন ভয়। এতগুলি মৃত

মানুষের নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রভাব আছে। আমি তখন ভিতর থেকে বের হয়ে এলাম।

ফিউসলেজ থেকে একটু সরে একটা গাছের নিচে আগুন জ্বালাতে পারলে হত—কিন্তু আগুন জ্বালানোর কিছু নেই, হাতের আঙুল ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আছে, কিছু খুঁজে বের করারও আর ক্ষমতা নেই, তাই সে-চেষ্টা করলাম না। আমি পাহাড়ে বহু রাত কাটিয়েছি, প্রতিকূল অবস্থায় কেমন করে বেঁচে থাকতে হয় জানি, কাজেই সেটা নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা ছিল না। যেটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল সেটা খুব বিচিত্র, শুধু মনে হচ্ছিল ফিউসলেজের ভিতরকার মৃতদেহগুলি বেঁচে গেছি বলে আমার উপর ভয়ানক রেগে আছে। তারা সবাই মিলে একটা প্রতিশোধ নেবে। ভয়ংকর ইচ্ছে করছিল এই ফিউসলেজ থেকে দূরে সরে যেতে।

কিন্তু গরম কাপড় পরে শরীরটায় উষ্ণতা ফিরে আসার পর আমার চিন্তাও খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। আমি জানি প্লেনটাকে খোঁজ করার জন্যে উদ্ধারকারী দল আসবে এখানে, আমি যদি দূরে সরে যাই আমাকে আর খুঁজে পাবে না। আজ রাতে আমাকে যদি খুঁজে না পায়, আমার বেঁচে যাবার সম্ভাবনা কম। আমি তাই ফিউসলেজের কাছেই থেকে গেলাম। চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিই, যখন ঠাণ্ডায় শরীর একেবারে অবশ হয়ে যায়, উঠে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে শরীরে একটু উষ্ণতা ফিরিয়ে আনি।

আশ্চর্য নীরব রাত সেটি। মাঝরাতে চাঁদ উঠল, সাথে সাথে পুরো পাহাড় বনাঞ্চল আলোকিত হয়ে উঠল। পাখা ভেঙে গেছে বলে প্লেনের ফিউসলেজটাকে দেখাচ্ছে একটা সাপের মতো। মাঝখানে ভাঙা, উঁচু হয়ে আছে। আমি বসে বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। হঠাৎ করে আমি দেখলাম প্লেনের ভাঙা অংশের মাঝখানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

ভয়ানক ভয় পেলাম আমি। চিৎকার করতে গিয়ে অনেক কষ্টে শান্ত করলাম নিজেকে। কী হবে চিৎকার করে?

আমি আবার তাকালাম সেদিকে। একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাত উড়ে গেছে তার, রক্তে মাখামাখি শরীর। কোথা থেকে এসেছে সে?

মানুষটা সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ে আমার সারা শরীর শিউরে উঠল।

আমি দেখলাম, প্লেনের ভিতর থেকে আরেকজন মানুষ বের হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথার একপাশ থেঁতলে ভিতরে বসে গেছে তার। তারপর আরেকজন।

মৃত যাত্রীরা উঠে আসছে। এক এক করে। ভয়ংকর আতঙ্কে আমি দিশেহারা হয়ে গেছি। তার মাঝে দেখলাম, তারা একে একে ফিউসলেজ বেয়ে নেমে আসছে। নরম তুষারে পা ফেলে ধীরে ধীরে আসছে আমার দিকে। অনেকটা দম-দেওয়া পুতুলের মতো।

www.MurchOna.com

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কোথায় যাব আমি? কী করব?

দেহগুলি আস্তে আস্তে হাত তুলে এগিয়ে আসে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে আবার। আমি শোনার চেষ্টা করলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি, হঠাৎ বুঝতে পারলাম, সবাই বলছে, আমার কাপড়—আমার কাপড়—

আমি আর পারলাম না। ভয়ংকর একটা চিৎকার করে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করলাম। পাথরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লাম একবার। কোনোমতে উঠে আবার ছুটতে শুরু করেছি, তখন হঠাৎ প্রচণ্ড আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পেলাম হেলিকপ্টারের শব্দ। উদ্ধারকারী দল এসে গেছে।

সহযাত্রী একটু থেমে ছোট বোতলটার অবশিষ্ট তরলটুকু কোঁত করে গিলে ফেলল। আমি সাবধানে নিশ্বাসটা বের করে বললাম, তারপর?

হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সহযাত্রী বলল, বেঁচে গেলাম আমি। সবাই বলে আমি নাকি দীর্ঘদিন পাগল হয়ে ছিলাম। আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছি।

ভালো হচ্ছ? এখনও হওনি?

পুরোপুরি হইনি।

লোকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, এখনও কোনো পাহাড়ে কিংবা বরফের উপর যেতে পারি না। প্লেনে চড়তে ভয় হয়। মাঝে মাঝে কোনো কারণ ছাড়াই ভয়ংকর শীত লাগতে থাকে, তখন নাকি লোকজনের গা থেকে জোর করে কাপড় খুলে নিতে চেষ্টা করি।

আমি কিছু না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা হঠাৎ একটু শিউরে উঠল। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

না, কিছু না, একটু শীত করছে।

শীত করছে? শীত! আমি লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে থাকি, এয়ার-হোস্টেস, এয়ার-হোস্টেস, একটি কম্বল এদিকে, কম্বল—

প্লেনের সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

বন্ধ ঘর

আমাকে একবার কিছুদিনের জন্য পচাগর যেতে হয়েছিল। কাউকে চিনি না আমি সেখানে, আমার অফিসের একজন একটা বাসা খুঁজে বের করে দিল। বাসার মালিক আমাকে চাবিটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, থাকেন এখানে যতদিন খুশি। তবে—

তবে কী?

রাতবিরেতে বাসায় নানারকম শব্দ শোনা যায়, ভয় পাবেন না।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কিসের শব্দ?

ভদ্রলোক কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, লোকে বলে ভূতের। তবে কখনো কারও ক্ষতি করে না।

পরিষ্কার দিনের আলোয় কথা বলছি, ভদ্রলোকের মুখে ভূতের নামটি এত হাস্যকর শোনাল যে বলার নয়! আমি ভদ্রতা করে হাসি গোপন করে বললাম, ক্ষতি করলেই আর কী! আমার কী আছে ক্ষতি করার?

ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে বললেন, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ভূত, প্রেত, জিন, পরী, রাক্ষস এবং খোক্কস—এই ছয়টি জিনিস আমি বিশ্বাস করি না।

ভদ্রলোক একটু চিন্তিতভাবে বললেন, মানুষ চাঁদে গেছে, সেটাও অনেকে বিশ্বাস করে না। তবে এতে কিছু আসে যায় না, আপনি ভয় পান কি না সেটা হচ্ছে বড় কথা। ভূত বিশ্বাস করে না কিন্তু ভূতে ভয় পায় এরকম অনেক লোক আছে জানেন তো?

আমি বললাম, জানি। তবে আমি সেরকম লোক না। বাজি ধরে লাশকাটা ঘরে আমি রাত কাটিয়েছি।

ভদ্রলোক বললেন, চমৎকার! রাতবিরেতে খুটখাট শব্দ শুনলে মাথা ঘামাবেন না সেটা নিয়ে। ইদানীং কারও কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে শুনিনি।

আমি একটু কৌতূহলী হয়ে বললাম, ইদানীং ক্ষতি হয়নি বলছেন—আগে কখনো কি ক্ষতি হয়েছে?

ভদ্রলোক কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, সেটা অনেক লম্বা গল্প। অনেক পুরুষ থেকে বাসাটি আমাদের। আমার দাদার ছেলেবেলায় নাকি বীভৎস একটা ঘটনা ঘটেছিল একবার। দাদার বাবার সাথে এক তান্ত্রিকের গোলমাল লেগেছিল। সেই তান্ত্রিক নাকি পিশাচসিদ্ধ ছিল। তার পোষা পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছিল এই বাড়িতে। ছোট বাচ্চাদের নাকি কচমচ করে খেয়ে ফেলত সেই পিশাচ। অনেক কষ্টে পিশাচকে দূর করা হয়েছে। পুরোপুরি দূর হয়নি। এখনও রাতবিরেতে তার খুটখাট শব্দ শোনা যায়।

আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ-বাসায় এককালে পিশাচ ছোট বাচ্চাদের কচমচ করে খেয়ে ফেলেছিল শুনে কেমন জানি দমে গেলাম। পিশাচ না হোক, কোনো জন্তু-জানোয়ার নিশ্চয়ই কোনো বাচ্চাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কী ভয়াবহ ব্যাপার!

ভদ্রলোক বললেন, তারপর তিন পুরুষ পার হয়ে গেছে, কখনোই কিছু হয়নি। ভয় না পেলেই হল। শব্দ তো কতরকমই হয়।

আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, আমি ভয় পাব না।

ভদ্রলোক চাবিটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, দক্ষিণ দিকের ঘরটি তালা মারা আছে, সেটার চাবি নেই। ঘরটি সবসময় তালা মারাই থাকে।

সবসময়?

হ্যাঁ, একশো বছরের উপর হল।

কখনো খোলা হয়নি?

না। পিশাচদের দূর করার সাথে ঘরটার কী-একটা সম্পর্ক আছে। খোলা নিষেধ। আমার বাবা বলে গেছেন যেন কখনো খোলা না হয় ঘরটা। আমরা খুলিনি।

ঠিক আছে।

আমি বাসাটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাসাটি অনেক পুরাতন। ইদানীং নানারকম কাজকর্ম করা হয়েছে, তবু স্থানে স্থানে পুরানো বাসার চিহ্ন রয়ে গেছে। বাসার দক্ষিণের সেই ঘরটিও দেখলাম। মস্ত একটা তালা ঝুলছে, প্রাচীনকালের অতিকায় একটা তালা দেখে ভক্তি এসে যায়।

প্রথম দিন কাটল আমার জিনিসপত্র টানাটানি করে, তাই ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়ে গেল। খুব ক্লান্ত ছিলাম, বিছানায় শোয়ামাত্রই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে অনেক বেলাতে। ভূত বলে কিছু-একটা বাসায় আছে সেটা আমার মনেই ছিল না। ঘুমের মাঝে শুধু একটা

www.MurchOna.com

স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি দক্ষিণের বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে দরজার তালাটা ধরে টানাটানি করছি। কেন এ-স্বপ্ন দেখলাম কে জানে!

পরদিন রাতেও একই স্বপ্ন দেখলাম। বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে তালাটি ধরে টানাটানি করছি। স্বপ্নটি অত্যন্ত বাস্তব, যেন সত্যি সত্যি টানছি। তৃতীয় রাতে আবিষ্কার করলাম, স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যি আমি ঘুমের মাঝে হেঁটে হেঁটে বন্ধ ঘরের সামনে গিয়ে তালাটি ধরে টানাটানি করছি। ঘুমের মাঝে হাঁটাহাঁটি করার অভ্যাস আমার কোনো কালেই ছিল না, হঠাৎ কেন শুরু হল কে জানে! ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ লাগে বুঝতে আমি কোথায়, কী করছি। যখন বুঝতে পারলাম আমি বন্ধ ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তালাটি ছেড়ে সরে এলাম। আর ঠিক তখন প্রথম বার আমি বাড়ির মালিকের বলা ভুতুড়ে শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটি ঘরটির ভিতর থেকে আসছে। কেউ যেন লাথি মারছে দেয়ালে, ধুপ ধুপ একটা শব্দ। একটানা অনেকক্ষণ শব্দ হয়, তারপর থেমে যায়। তারপর আবার হঠাৎ করে শুরু হয়।

প্রথমে আমার কেমন জানি একটা আতঙ্কের মতো হল, ইচ্ছে হল চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাই। কিন্তু এতদিনের বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত নিজেকে সাহস জোগাল, ব্যাখ্যার অতীত কোনো জিনিস নেই, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি সাহস করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেকে একটু শান্ত করে আমি সুইচটা বের করে বাতি জ্বালালাম। সাথে সাথে ম্যাজিকের মতো ভিতরের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আলোতে যাবতীয় ভুতুড়ে এবং রহস্যময় জিনিসও যেন উবে গেল। ঘরটি ভালো করে দেখলাম, চারদিক বন্ধ, কোনো দরজা বা জানালা নেই। ভিতরে শব্দটা কেমন করে হয় কে জানে! ব্যাপারটা কী হতে পারে, সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে আমি ঘরে ফিরে গেলাম ঘুমানোর জন্য। ঘরটি খুলে দেখার একটা বৈজ্ঞানিক ইচ্ছা প্রথমবার আমার মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল।

পরের দিন একজন অতিথি এল আমার বাসায়—মোটাসোটা একটা হুলো বিড়াল। বিড়াল আমি দুচোখে দেখতে পারি না, কিন্তু এই নির্বোধ পশুটি এত বন্ধুভাবাপন্ন যে আমি তাকে দূর করে দিতে পারলাম না। একেবারে আমার গা-ঘেঁষে লেজ লম্বা করে মিঁয়াও মিঁয়াও করে ডাকাডাকি করে এমন আহ্লাদ শুরু করল যেন কতদিন থেকে আমাকে চেনে! কষে একটা লাথি দেব দেব করেও আর দিলাম না। খাবার জন্য আধখানা কলা ছিল, তা-ই ছুড়ে দিলাম তার দিকে। বিড়াল কলা খায় না সেটা আমি তখনই জানতে পারলাম। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থেকে রাতে ফিরে এসে এই স্বাস্থ্যবান হুলো বিড়ালটিকে খারাপ লাগল না। বাসায় রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই। বাইরে থেকে খেয়ে আসি। তাই বিড়ালটার জন্য পরদিন কিছু বিস্কুট কিনে আনলাম। দেখা গেল বিড়ালটির বিস্কুটেও খুব রুচি নেই। আমার কাছে এসেছে খানিকটা বন্ধুত্বের জন্যে। কষে লাথি না মেরে সেটা তো দিয়েছিই, এর বেশি আর কী করতে পারি?

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

রাতে একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল বিড়ালটির চিৎকারে। মাঝরাতে বিড়ালের কান্না ভয়াবহ জিনিস, খানিকক্ষণ চিৎকার করে থেমে যায়, আমার চোখে যখন ঘুম নেমে আসে বিড়ালটি তখন আবার কান্না শুরু করে। কয়েকবার চেষ্টা করে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম, ঠিক তক্ষুনি শুনতে পেলাম বন্ধ ঘরে ধুপ ধুপ করে সেই শব্দটা হচ্ছে। হঠাৎ করে কেন জানি আমার শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি মোটামুটি দুঃসাহসী মানুষ। দুঃসাহসী মানুষ ভয় পায় না সেটা সত্যি নয়, দুঃসাহসী মানুষেরাও ভয় পায়। তবে ভয় পেলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখে। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে দেখা যায়, যে-জিনিসটা দেখে ভয় পাচ্ছে, সেটাতে ভয়ের কিছু নেই। আমিও মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজেকে বোঝালাম, শব্দ হচ্ছে সত্যি, কিন্তু শব্দটি অলৌকিক হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নিশ্চয়ই কোনো-একটি কারণ আছে। একটা-কিছু হয়তো বেকায়দাভাবে ঝুলছে, বাতাস এলেই ওটা নড়ে কোথাও লেগে শব্দ হচ্ছে। কিংবা কে জানে হয়তো স্বাস্থ্যবান কিছু ইঁদুর, বেড়াল বা অন্য কোনো জন্তু-জানোয়ার শব্দ করছে।

নিজেকে সাহস দিয়ে আমি ঘর থেকে বের হয়ে বন্ধ ঘরটির সামনে দাঁড়ালাম। সাথে সাথে ভিতরের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বিড়ালটিও তার কান্না থামিয়ে একটু ভয় পেয়ে যেন আমার দিকে তাকাল। আমি তার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই লেজ ফুলিয়ে এমন ভয়ংকর একটা ভঙ্গি করল যেন আর একটু এগুলেই সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি একটু সরে এলাম। এত বন্ধুভাবাপন্ন বিড়ালটি হঠাৎ খেপে গেল কেন কে জানে!

বিড়ালটি হঠাৎ আগের মতো কান্নার সুরে ডাকতে শুরু করে। শুধু যে ডাকতে শুরু করে তা-ই নয়, সাথে সাথে ছটফট করতে থাকে। একটা প্রচণ্ড অস্থিরতার মতো, একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে, হঠাৎ মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। ভারি বিচিত্র ব্যাপার! আমি কী করব বুঝতে না পেরে কষে একটা লাথি দেবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। ঠিক তক্ষুনি ঘরের ভিতর থেকে ধুপ ধুপ শব্দ শুরু হয়ে যায়। বিড়ালটি হঠাৎ থেমে গেল, তারপর মাটি খামচে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। ব্যাটা ভয় পেয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমারও ভয় করতে থাকে, সেটাই হয়েছে মুশকিল। ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না। মানুষ ভীতু হয়ে যায় তা হলে। আমি ঠিক করলাম ঘরের ভিতর ঢুকে দেখতে হবে কী আছে। কাছে গিয়ে তালাটা যেই স্পর্শ করেছি, সাথে সাথে ভিতরের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বিড়ালটাও দেখলাম সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন। লেজটা লম্বা করে একবার আদুরে গলায় ডাকল আমাকে।

তালাটি পুরানো হলেও মজবুত। ভাঙা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবার ভালো করে পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলাম কবজাগুলি ক্ষয়ে গেছে, সহজেই খুলে

আসবে। যাওয়ার সময় নতুন কবজা কিনে লাগিয়ে দিলেই হবে, বাড়ির মালিক কখনো জানতেও পারবেন না যে এটা খোলা হয়েছিল। আমি আমার যন্ত্রপাতির বাক্সটা নিয়ে এলাম। মানুষজন শুনে অবাক হয়ে যায়, কিন্তু সত্যি আমার একটা ছোট যন্ত্রপাতির বাক্স আছে। সেই বাক্সে হাতুড়ি, প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, ড্রিল, নাট-বল্টু এসব থাকে। কখনো এই বাক্স আমি হাতছাড়া করি না, কাজেই প্রয়োজনের সময় একটা স্ক্রু-ড্রাইভারের জন্যে কখনোই আমার সারা বাড়ি আকাশ-পাতাল করে খুঁজে মেজাজ গরম করতে হয় না।

দরজার প্রথম কবজাটা খুলে শেষ করতে করতেই বিড়ালটির একটি পরিবর্তন হল। হাসিখুশি বিড়ালটি আবার খেপে গেল। চিৎকার করে লাফিয়ে কুদিয়ে এমন একটা ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করল যে, আমি সত্যি সত্যি এবারে কষে একটা লাথি লাগালাম। আশ্চর্য ব্যাপার, লাথি খেয়েও সেটা পালিয়ে গেল না। আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকতে থাকল। আর ঠিক তখন হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ধুপ ধুপ শব্দ শুরু হল। বিড়ালটা তখন আবার ভয়ে আধমরা হয়ে আমার কাছে কোনোমতে এগিয়ে এল।

আমি এই মাঝরাতে কয়েকটি বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করলাম। প্রথমত, ঘরের ভিতরে ধুপ ধুপ শব্দ শুরু হওয়ার আগে বিড়ালটি কেমন করে যেন টের পায়। তখন সেটি ভয়ানক অস্থির হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, আমার এত জোরে লাথি খেয়েও বিড়ালটি পালিয়ে না গিয়ে আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। এই জায়গাটি ছেড়ে বিড়ালটির সরে যাবার ক্ষমতা নেই। কিছুক্ষণের মাঝে রহস্য পরিষ্কার হবে চিন্তা করে আমি জোর করে উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি।

ভিতরে ধুপ ধুপ শব্দের মাঝেই আমি দরজার দ্বিতীয় কবজাটি খুলে ফেলি। টেনে পুরানো ভারী দরজা সরাতেই আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সামনে দেয়াল। ইট গেঁথে কে যেন পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। আশাভঙ্গ না হয়ে আমি কেন জানি খুশি হয়ে উঠলাম। ভিতরে ঢুকে কী দেখব সেটা নিয়ে কেমন একটা চাপা অশান্তি আর ভয় ছিল। এখন ঢুকতে পারব না জেনে নিজের অজান্তেই খুশি হয়ে উঠলাম!

নিজের ঘরে ফিরে এসে আমি পুরো ব্যাপারটা আবার খানিকক্ষণ ভাবলাম। সবাই জানে আমি দুঃসাহসিক ব্যক্তি। সেটি সত্যি নয়, আমি আসলে ভীতু। ঘরটায় ঢুকতে না পেরে তাই খুশি হয়ে উঠেছি। নিজের কাছে নিজেকে ছোট করা যায় না। আমি তাই আবার উঠে দাঁড়ালাম, দেয়ালটি ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হবে। প্রমাণ করতে হবে আমি ভীতু নই।

জিনিসটি যত কঠিন ভেবেছিলাম তত কঠিন নয়। নিশ্চয়ই প্রচুর বালু মেশানো ছিল। একটু চেষ্টা করতেই একটা ইট খুলে এল। ইট সরে এসে দেয়ালে ছোট একটা গর্ত হয়েছে। ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখি ভিতরে নিশ্ছিদ্র

www.MurchOna.com

অন্ধকার। আমার যন্ত্রপাতির বাক্সে একটি ছয়-ব্যাটারির টর্চলাইট থাকে। আমি সেটা নেবার জন্যে নিচু হতেই একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। বিড়ালটি হঠাৎ আবার খেপে উঠে চিৎকার করে দেয়ালের উপর আঁচড়াতে থাকে। তারপর কিছু বোঝার আগেই কয়েকটা লাফ দিয়ে সেই গর্তটা ধরে ঝুলে পড়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে।

একটা বিড়াল ছোট একটা গর্তে ঢোকার চেষ্টা করছে সেটা বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু আমি অবাক হয়েছি অন্য কারণে। বিড়ালটি ভয়ংকর ভয় পেয়েছে। কিন্তু ভয় পেয়েও সে গর্তটা দিয়ে ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি বিড়ালটি ঘরটাতে ঢুকতে চায় না। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। আমি পশুবিশারদ নই। কিন্তু বেঁচে থাকাসংক্রান্ত আদিম প্রবৃত্তিগুলি মানুষ আর পশু সবার বুঝি একই রকম।

বিড়ালটিকে টেনে নামিয়ে আনব আনব করতে করতেই সেটি ভিতরে ঢুকে গেল। ভিতরে খানিকক্ষণ প্রাণ-ফাটানো চিৎকার আর হুটোপুটি জাতীয় একটা শব্দ হল, তার পর হঠাৎ কোনো শব্দ নেই। একেবারেই কোনো শব্দ নেই। ভয় পেলে মানুষের শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে যায় বলে শুনেছিলাম। সত্যি সত্যি সেটা আমার শিড়দাঁড়া দিয়ে বয়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে ছোট গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকি। কেন জানি মনে হয়, এখনই গর্ত থেকে একটি বীভৎস মুখ বের হয়ে আসবে। ঘরটিতে একটি পিশাচ বন্দি করে রাখা ছিল। আমি নিশ্চয়ই তাকে খুলে দিয়েছি।

কয়েক মুহূর্ত আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। গর্তটি থেকে কিছু বের হল না। কিছু দেখাও গেল না। আমি বড় টর্চলাইটটা নিয়ে আস্তে আস্তে গর্তের কাছে এগিয়ে গেলাম। সাবধানে আলোটা ভিতরে ফেলে উঁকি দিলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না, ছোট একটা চৌকোণা ঘর, ভিতরে কিছু নেই। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এইমাত্র বিড়ালটা লাফিয়ে ঢুকেছে ভিতরে, বিড়ালটাও নেই। বিস্ময় থেকেও আমার বেশি হল আতঙ্ক। ছয়-ব্যাটারির বড় টর্চলাইটের তীব্র আলোতে ঘরটা আলোকিত হয়ে আছে, কোথাও কিছু নেই। শুধু ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একটা বৃত্ত আঁকা, ধুলায় ঢাকা পড়ে গেছে, আবছা দেখা যায়। সেই বৃত্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। আর হঠাৎ করে কোথা থেকে জানি ঘরের ঠিক মাঝখানে বিড়ালের মাথাটা পড়ল। কেউ যেন কামড়ে মাথাটি আলাদা করে নিয়েছে। রক্তে মাখামাখি বীভৎস একটা জিনিস।

আমি একটা চিৎকার করে সরে এলাম। থরথর করে শরীর কাঁপছে, কিছুতেই থামাতে পারছি না। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করলাম। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, আমি খুলে-আনা ইটটা তুলে গর্তটা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কেন জানি মনে হল আমার এখন ভিতরে ঢুকতে হবে। ভয়ে আমার

www.MurchOna.com

শরীর কাঁপছে। কিন্তু তবু আমার মনে হতে থাকল ভিতরে ঢুকতে হবে। কেন সেটা জানি না, কিন্তু ঢুকতেই হবে। একটু আগে বিড়ালটিও ভয় পেয়েছিল, তবু বিড়ালটি ঢুকেছিল। এখন আমিও ভয় পেয়েছি, কিন্তু আমাকেও ঢুকতে হবে। প্রচণ্ড জ্বর হলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা যেরকম গুলিয়ে যায়, আমারও সেরকম হল। হাতুড়ির আঘাতে আমি দ্রুত দেয়াল থেকে ইট খুলে নিতে থাকি। কয়েক মিনিটেই কোনোমতে শরীর গলিয়ে ঢুকে যাওয়ার মতো একটা বড় গর্ত করে ফেললাম।

ঠিক কীভাবে আমি ভিতরে ঢুকেছি পরিষ্কার মনে নেই। শুধু আমার মনে হচ্ছিল ঘরের ভিতর ঢুকলে ভয়ানক কিছু-একটা ঘটে যাবে। কিন্তু তবু আমাকে ঢুকতেই হবে। ভিতরে ঢুকে মনে হল কিছুতেই ঘরের মাঝখানে যাওয়া ঠিক হবে না, কিন্তু ভয়ানক কিছু-একটা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে মাঝখানে যাওয়ার জন্যে। আমার হঠাৎ বিড়ালটির কথা মনে পড়ল। অসহায় বিড়ালটি কীভাবে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল। আমিও কি সেই বিড়ালটির মতো শেষ হয়ে যাব? আমার ছিন্ন মাথাটাও কি বৃত্তের মাঝখানে এসে পড়বে? ভয়াবহ আতঙ্কের মাঝেও বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তি ভিতরে কাজ করতে থাকে। আমি জোর করে নিজেকে ঘরের এক কোনায় টেনে নিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে থরথর করে কাঁপতে থাকি। প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি নিজের আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে।

ঘরের মাঝখানে হঠাৎ একটা হুটোপুটির মতো শব্দ হল, মুখে গরম বাতাসের হলকা এসে লাগল। সাথে সাথে মাংস পোড়ার মতো একটা গন্ধ আসছে কোথা থেকে। কিছু-একটা আছে এই ঘরে, ভয়ংকর শক্তিশালী একটা-কিছু, প্রচণ্ড আক্রোশে সেটা ছিন্নভিন্ন করে দেবে সবকিছু। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি এই ঘরে আমার সাথে আরও একজন আছে। ভয়ংকর অশুভ একটা জীব, দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে কে? আমার নিশ্বাস আটকে আসতে থাকে। সমস্ত শরীর ঘামতে থাকে কুলকুল করে। ঘরের মাঝখানে আবার একটা শব্দ হল, বীভৎস একটা শব্দ, গরম বাতাসের হলকা আবার ছুঁয়ে গেল আমাকে। আমি আহত পশুর মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আরও পিছিয়ে আসি। গোঙানোর মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। আমি জানি আমার আরকিছু করার নেই। ভয়ানক এক অশুভ প্রাণী আমাকে পেয়েছে তার হাতের মুঠোয়, এক মুহূর্তে আমি শেষ হয়ে যাব চিরদিনের মতো।

পিছিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ হাতে কী যেন ঠেকল, একটি কাগজের মতো। ছোঁয়ামাত্র হঠাৎ আশ্চর্য একটি ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ ঘরটা আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে গেল, আর প্রথমবার আমি পুরোপুরি সংবিৎ ফিরে পেলাম। প্রচণ্ড আতঙ্কটা নেই, এখনও বুক ধুকধুক করে শব্দ করছে, কিন্তু অসহায় পশুর সেই

www.MurchOna.com

আতঙ্কটুকু যেন উবে গেছে। আমার হাতের ছয়-ব্যাটারির টর্চটা জ্বালালাম আমি। হাতে এক টুকরো মোটা কাগজ, উপরে কী যেন আঁকিবুকি করা। নিচে গোটাগোটা হাতে কী যেন লেখা। হাতের লেখা প্যাঁচানো, পড়তে কষ্ট হয়, কিন্তু পড়া যায়। সেখানে সাধু ভাষায় লেখা :

"যাহার হাতে এই কাগজ তাহার সমূহ বিপদ। অতএব এই কাগজ সে হাতছাড়া করিবেক না। তাহা হইলে পিশাচ অবিলম্বে দেহনাশ করিবেক। কোনোমতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিবেক না। পিশাচ তিন গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল, ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে দুই গণ্ডী ছিন্ন হয়। তৃতীয় গণ্ডী দুর্বল, অবিলম্বে নূতন গণ্ডী প্রদান করিবেক, নতুবা পিশাচ মুক্ত হইবেক। ..."

এরপর কীভাবে পিশাচকে আটকে রাখার জন্যে আরও দুটি গণ্ডি দিতে হবে সেটা লেখা রয়েছে।

আমি ভূত-প্রেত কিংবা পিশাচ বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই জীর্ণ কাগজে লেখা নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে দুটি নতুন বৃত্ত এঁকে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। ইট গেঁথে দেয়াল বন্ধ করার আগে কাগজটি আবার ভিতরে রেখে দিলাম। ভবিষ্যতে আমার মতো কেউ যদি ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে, কে জানে হয়তো এটাই আবার তার প্রাণ বাঁচাবে।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

গাড়ি

আমি তখন নতুন আমেরিকায় এসেছি। সিয়াটল নামে একটি শহরে থাকি। সিয়াটল একেবারে একটা ছবির মতো শহর—নীল হ্রদ, সবুজ চিরহরিৎ গাছ আর তুষারে-ঢাকা পাহাড় দিয়ে ঘিরে রয়েছে শহরটি। দেখে মন জুড়িয়ে যাওয়ার কথা। আমার কিন্তু একেবারেই দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা। না, শহরটির কোনো দোষ নেই, দোষ আমার কপালের, পুরো শহরে তখন বাঙালি বলতে আমি একা। দেখে বাঙালি মনে হয় ওরকম মানুষ দেখলেই আমি তখন ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ভাই, আপনি বাংলা জানেন? দেখা যায় তাদের কেউ শ্রীলংকার মানুষ, কেউ-কেউ দক্ষিণ ভারতীয়। একজন আবার বের হল মাদাগাস্কার! সারাদিন কাজকর্ম করে রাতে যখন বাসায় ফিরে আসি, তখন মাঝে মাঝে মনে হয় ডাক ছেড়ে কাঁদি। তখন মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি ধারকর্জ করে প্লেনের টিকেটের টাকাটা তুলে ফেলেই দেশে চলে যাব। মাসখানেকের বেশি এদেশে থাকছি না। মানুষ বড় বিচিত্র জীব, তিনমাসের মাথায় আবিষ্কার করলাম—বাংলায় কথা না বলার কষ্টটা সয়ে এসেছে। নিজে রান্না করা শুরু করেছি। গরম ভাতে আলুভর্তা আর মাখন দিয়ে খেতে একেবারে অমৃতের মতো লাগে। একটি চীনে দোকান আবিষ্কার করলাম, সেখানে আবার কাঁচামরিচও পাওয়া যায়। আলুভর্তায় কাঁচামরিচ কুচি করে দিয়েই নিজের রান্নার উপর আত্মবিশ্বাস দশগুণ বেড়ে গেল।

এভাবে বছরখানেক পার হয়ে গেল। বাঙালি ছেলে, কোনোরকম বদ অভ্যাস নেই, মদ গাঁজা খাই না, ঊনষাট ডলার ভাড়া দিয়ে একটা খুপরিতে থাকি। মাসের শেষে বেতনের যে-পরিমাণ টাকা পাই পুরোটাই বেঁচে যায়। ছয়মাসের মাথায় আবিষ্কার করলাম ব্যাংকে প্রায় সাতশো ডলার জমা হয়ে গেছে। দেশের টাকায় হিসাব করলে আমি তখন রীতিমতো বড়লোক। ঠিক তখন একটা গাড়ি কিনে ফেললাম।

www.MurchOna.com

গাড়ি কেনার আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। চালাতে পারি না কিছু না, গাড়ি দিয়ে আমি কী করব? কিন্তু তবু গাড়ি কিনে ফেললাম। কেন কিনলাম সেটা এখনও আমার নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। সম্ভবত দেশে আজীবন মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ হয়েছি, গাড়ি যারা চড়ে তাদের দূর থেকে দেখে এসেছি, সবসময়েই ভেবে এসেছি যারা গাড়ি চড়ে তারা বুঝি অন্য জগতের মানুষ, পৃথিবীর সব সুখ বুঝি তাদেরই। তাই যখন হঠাৎ করে দেখলাম আমার কাছে যে-টাকা আছে সেটা দিয়ে একটা গাড়ি—পুরানো হলেও সত্যিকারের গাড়ি, কিনে ফেলা যায়, আমি আর দেরি করলাম না।

আমার এক বন্ধু সেটা চালিয়ে আমার বাসার সামনে এসে রেখে গেল। আমি সকাল-বিকাল সেটাকে দেখি, ঝেড়ে-পুছে রাখি। সময় পেলেই ভিতরে বসে থাকি। ভিতরে একটা রেডিও আছে, সেটা চালিয়ে আবহাওয়ার খবর শুনি।

গাড়ি চালানো শিখে নিতে হল তাড়াতাড়ি। ঘরের সামনে একটা ঢাউস গাড়ি পড়ে আছে, আমি শুধু ভিতরে বসে রেডিওটা চালিয়ে গান শুনি, ব্যাপারটাতে কেমন জানি একটা হাস্যকর দিক আছে। আমার আমেরিকান বন্ধুরা কয়েকজন মিলে আমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিল। প্রচণ্ড ধৈর্য তাদের, আমি লিখে দিতে পারি, কোনো বাঙালি বন্ধু আমাকে সেটা শেখাতে পারত না। ফজলুল হক হলে যখন থাকতাম, একবার ব্রিজ খেলা শেখার চেষ্টা করেছিলাম। ভুল ডাক দিয়েছিলাম বলে বন্ধুর কাছে এমন গালি শুনেছি যে, ব্রিজ খেলাতেই ঘেন্না ধরে গেছে, খেলাটাই আর শেখা হল না।

গাড়ি চালানো শেখার পর প্রথম প্রথম কয়দিন একটু ভয়ে ভয়ে চালাতাম। সবসময়ে মনে হত অন্য সবাই বুঝি আমার গাড়ি চালানো দেখে হাসাহাসি করছে। কয়দিন পরেই বুঝতে পারলাম আমাকে নিয়ে লোকজন মোটেই হাসাহাসি করছে না। অন্য দশটা গাড়িকে লোকজন যেভাবে দেখছে আমাকেও ঠিক সেভাবেই দেখছে। কিছু-একটা ভুল করে তাদের অসুবিধে করলে একটু বিরক্ত হতে পারে, কিন্তু হাসাহাসি কখনো করবে না। তখন আমার সাহস বেড়ে গেল। কাজ থেকে ফিরে এসে আমি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যেতাম। কাজ নেই কর্ম নেই, কোথাও যাবার উদ্দেশ্য নেই, শুধু গাড়ি চালানোর জন্যই বের হওয়া। সস্তা গাড়ি, সেজন্যে গাড়িটা একটু বড়, পেট্রল লাগে বেশি। কিন্তু এখানে পেট্রল ভারি সস্তা। পেট্রলকে অবশ্যি পেট্রল বলে না, বলে গ্যাস—গ্যাসলিনের সংক্ষেপ। মাসখানেকের মাঝেই আমি গাড়ি চালানোতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমাকে দেখে কে বলবে, বছরখানেক আগেও আমি কয়বার গাড়িতে উঠেছি হাতে গুনে বলে দেয়া যেত!

বাঙালিদের থেকে আলাদা থেকে আমার আরও একটি পরিবর্তন হয়েছে, সেটা আমি তখনও জানি না। সেটা টের পেলাম একদিন দুপুরবেলা, যেদিন

www.MurchOna.com

অফিসে আমার একটা ফোন এল। ফোন ধরতেই শুনলাম একজন পরিষ্কার বাংলায় বলছে, জাফর ইকবাল সাহেব? আপনি কি বাংলাদেশের?

আমি বলতে চাইলাম, জি, আমি বাংলাদেশের। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমার মুখে বাংলা কথা আসছে না। ইংরেজিতে বললাম, হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের।

অপর পাশে ভদ্রলোক ইংরেজি উত্তর শুনে কেমন জানি মিইয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, আপনি বাংলাদেশ থেকে কবে এসেছেন?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার আমার মুখ থেকে ইংরেজি বের হয়ে এল। ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি বাংলায় কথা বলতে পারেন না?

আমি কাতর স্বরে প্রায় জোর করে প্রথমবার বাংলায় বললাম, পারি। তারপর ইংরেজিতেই বলতে হল, আমি প্রায় এক বছর বাংলায় কথা বলিনি। তাই মুখে বাংলা আসছে না। একটু ধৈর্য ধরেন আপনি—আমি ঠিক বাংলায় কথা বলব।

সত্যি, তা-ই হল। মিনিট দুয়েক পরে হঠাৎ করে মুখের বাঁধন খুলে গেল। আর আমার মুখে বাংলা কথা যেন খইয়ের মতো ফুটতে শুরু করল।

ভদ্রলোকের নাম আবিদ হাসান, একটা কনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কী-একটা প্রাইজ পেয়েছেন, বিনয়ী ভদ্রলোক টেলিফোনে ঠিক পরিষ্কার করে বললেন না। প্রাইজ দেওয়ার জন্যে কনফারেন্সের লোকজন তাঁকে সপরিবারে এনেছে। ওয়াশিংটন প্লাজা নামে এখানকার সবচেয়ে ভালো হোটেলের একটা বড় সুইটে যত্ন করে রেখেছে। হাতখরচের জন্যে এত টাকা দিয়েছে যে তিনি নাকি দুই হাতে খরচ করেও শেষ করতে পারছেন না। আমাকে অবশ্যি এসব বলার জন্যে ফোন করেননি। অনেক খুঁজে-পেতে আমাকে বের করেছেন, এক সপ্তাহ হয়ে গেছে কোনো বাঙালি না দেখে নাকি হাঁপিয়ে উঠছেন, তাই। তার চেয়ে বড় কথা ভাত খাওয়ার জন্যে নাকি তাঁর পুরো পরিবার প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে। আমি কোনো বাঙালি রেস্টুরেন্টের ঠিকানা জানি কি না আর তাদের সাথে সেই রেস্টুরেন্টে যেতে পারব কি না জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, কোনো বাঙালি রেস্টুরেন্টের কথা আমার জানা নেই। কিছু ভারতীয় রেস্টুরেন্ট চিনি। যদি আপত্তি না থাকে আমার বাসায় এলে ভাত রান্না করে খাওয়াতে পারি। ভদ্রলোক ভদ্রতা করে যেটুকু আপত্তি করতে হয় তার বেশি না করেই রাজি হয়ে গেলেন। আমি আমার গাড়ি করে নিয়ে আসতে চাইলাম, তিনি বললেন, তার প্রয়োজন নেই। একটা ট্যাক্সি করে চলে আসবেন।

আমি প্রফেসরকে বলে সকাল-সকাল বাসায় চলে এলাম। একা মানুষ ঊনষাট ডলারের একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। সে-অ্যাপার্টমেন্টের যা অবস্থা, আগে গিয়ে পরিষ্কার না করলে কারও ঢোকার সাধ্যি নেই! আগে দোকান থেকে

একটু বাজার করে আনলাম, বাসায় প্রথম বার অতিথি আসছে, তাও বাঙালি অতিথি, একটু যত্ন তো করতেই হয়।

ঘরদোর পরিষ্কার করে কিনে-আনা মুরগি কেটেকুটে পরিষ্কার করতে করতে দরজায় শব্দ হল। খুলতেই দেখি একজন বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি আবিদ হাসান, আপনি নিশ্চয়ই জাফর ইকবাল? এই আমার স্ত্রী রুখসানা আর আমাদের মেয়ে রুণু। জোর করে আপনার বাসায় খেতে চলে এলাম। বাঙালির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কী আশা করবেন?

আমি বললাম, কী যে বলেন আপনি! আমি এক বছরের উপর কোনো বাঙালিকে দেখিনি। আজ আপনাদের দেখলাম। তাও ভেজাল বাঙালি নয়, একেবারে খাঁটি বাংলাদেশের বাঙালি!

বাচ্চা মেয়েটি তার মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, ভিতরে ঢুকে একটু অবাক চোখে এদিক-সেদিক তাকাল। আমি বললাম, আপনারা আসবেন জানলে ঘরদোর আরও আগে থেকে পরিষ্কার করে রাখতাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, অনেক পরিষ্কার আছে, একা মানুষের বাসা এর চেয়ে পরিষ্কার থাকলে ভালো দেখায় না।

বললাম, বাঁচালেন আপনি। আপনারা একটু বসুন, আমি দেখতে দেখতে রান্না শেষ করে ফেলব। খেতে পারবেন কি না জানি না, কিন্তু রান্না হয়ে যাবে।

ভদ্রমহিলা বললেন, ছি! আপনি কী রাঁধবেন? এত তাড়াহুড়ো করে তা হলে এলাম কীজন্যে? কোথায় রান্নাঘর দেখিয়ে দিন আমাকে।

আমার কোনো আপত্তি না শুনে তিনি কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে রান্না শুরু করে দিলেন। আমি যে খুব আপত্তি করেছিলাম সেটা দাবি করব না, একজন বাঙালি মহিলার রান্না কতকাল খাই না! হেলা করে সে-সুযোগ নষ্ট করার কী অর্থ হতে পারে?

বসার ঘরে আমি ভদ্রলোক আর তাঁর মেয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকি। দেখা গেল ছেলেবেলায় তিনি আমার স্কুলে বছরখানেক পড়াশুনা করেছিলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার অঙ্ক-স্যার নাকি তাঁকেও অঙ্ক করিয়েছেন!

ভদ্রলোকের মেয়েটি ভারি মিষ্টি। এদেশের বাচ্চাদের মতো ডানপিটে নয়। কেমন জানি একটা বাঙালিসুলভ কোমলতা আছে। আমি ছোট বাচ্চাদের সাথে ঠিক করে কথাবার্তা বলতে পারি না। ছোট বাচ্চারা যেটুকু বুঝতে পারে বলে আমার ধারণা, দেখেছি তারা তার থেকে ঢের বেশি বোঝে। নেহায়েৎ প্রয়োজন না হলে আমি ছোট বাচ্চাদের ধারেকাছে ঘেঁষি না। এ-বাচ্চাটির বেলায় কিন্তু কীভাবে কীভাবে জানি আমার খুব ভাব হয়ে গেল। খুব সুন্দর কথা বলে

www.MurchOna.com

মেয়েটি। কোনো পাকামো নেই, একটা শিশুসুলভ সরলতা আছে। তার সাথে কথাবার্তা হল এরকম :

ইকবাল চাচা, আপনি রান্না করতে পারেন?

একটু একটু পারি।

আব্বু তো পারে না।

তোমার আম্মু নিশ্চয়ই খুব ভালো রান্না করতে পারে, সেজন্যে তোমার আব্বু শেখেনি।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, আপনার বউ নেই?

না।

আপনার যখন বউ হবে, সে কি আপনার থেকে ভালো রান্না করবে?

সেটা তো এখনও জানি না। তোমার কী মনে হয়?

মনে হয় পারবে না। আপনার তো অনেক বেশি প্র্যাকটিস।

তা ঠিক।

অনেকদিন পর খুব ভালো করে খেলাম। রুখসানা ভাবি খুব ভালো রান্না করেন। নিজের রান্না খেয়ে প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম ভালো খাওয়া কাকে বলে। খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় গল্পগুজব হল। রুণু আমার গা-ঘেঁষে বসে থেকে আমাদের গল্প শুনতে শুনতে একসময় আমার পায়ের উপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত শিশুর মুখে এত নিষ্পাপ একটা ভাব থাকে আমার জানা ছিল না। বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে কেন জানি আমার বুকের ভিতর মমতায় টনটন করতে থাকে।

অনেক রাতে তাঁরা উঠলেন। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে চাইছিলেন, আমি তাঁদের রাজি করিয়ে গাড়ি করে তাঁদের হোটেলে পৌঁছে দিলাম। রুণু ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে ছিল, কিন্তু গাড়িতে ওঠামাত্র হঠাৎ করে পুরোপুরি জেগে উঠল। তার মা চেষ্টা করলেন আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে, কিন্তু সে আর ঘুমাল না। পিছনের সীটে জ্বলজ্বলে চোখে চুপচাপ বসে রইল। সারা সন্ধে আমার সাথে কথা বলেছে, কিন্তু এখন কেন জানি সে আর একটি কথাও বলল না। ওয়াশিংটন প্লাজাতে নামিয়ে দেওয়ার পর দেখলাম, সে তার বাবার ঘাড়ে মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়ের উপর সারাদিন নিশ্চয়ই খুব ধকল গেছে।

পরদিন খুব সুন্দর রোদ উঠল। দেশের লোকজন রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের কদর করে না। প্রতিদিনই রোদ উঠলে কদর করবেই-বা কেন? সিয়াটল শহরে সমুদ্রের জোলো হওয়ার স্পর্শ, প্রায়দিনই থমথমে বৃষ্টি, তাই হঠাৎ করে রোদ উঠলেই কেন জানি ভালো লাগতে থাকে। এই শহরে সুন্দর দিনে আরও একটি ব্যাপার ঘটে, শখানেক মাইল দূরে মাউন্ট রেইনিয়ার নামে একটি পর্বতের চুড়ো আছে, সেটি দেখা যায়। ভারি সুন্দর সেই পাহাড়ের চুড়ো। আজও সেটা দেখা যেতে

www.MurchOna.com

লাগল, ঝকঝকে পাহাড়ে ধবধবে সাদা বরফের আভরণ, অপূর্ব একটি দৃশ্য! এমন দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমার প্রফেসর আজকে আসেননি। ফাঁকি দেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো দিন আর কোথায় পাওয়া যায়? বের হবার আগে আমি আবিদ সাহেবের হোটেলে ফোন করলাম। ভাবি ফোন ধরলেন, আবিদ সাহেব কনফারেন্সে বের হয়ে গেছেন, ভাবি তাঁর মেয়েটিকে নিয়ে বের হবেন, একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। আমি জানতে চাইলাম তাঁরা কোথাও যেতে চান কি না, আমি নিয়ে যেতে পারি। শুনে ভাবি খুব খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি কোথাও একা একা যেতে চান না, এদেশে হাঁটাহাঁটি করতে তাঁর নাকি ভয় করে।

তাদের নিয়ে আমি একটু ঘোরাঘুরি করলাম। ভাবি একটু কেনাকাটা করলেন, মেয়েটি আমার হাত ধরে আপনমনে কথা বলে যেতে থাকে, ভারি ভালো লাগে শুনতে। চোখ বড় বড় করে হাঁটতে থাকে, এক জায়গায় রাস্তার মোড় ঘুরতেই হঠাৎ আবার দূরে মাউন্ট রেইনিয়ারকে দেখা গেল। মেয়েটি আগে কখনো পাহাড় দেখেনি, জিজ্ঞেস করলাম, রুণু, যাবে তুমি মাউন্ট রেইনিয়ার দেখতে?

মেয়েটির চোখ বড় বড় হয়ে যায়, কাছে থেকে?

হ্যাঁ।

একেবারে অনেক কাছে থেকে?

হ্যাঁ।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে মেয়েটির, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আম্মা, যাবে?

ভাবি কিছু বলার আগেই আমি বললাম, চলুন ভাবি, আপনাদের নিয়ে যাই। মাত্র একশো মাইল এখান থেকে। পাহাড়ি রাস্তা, তাই একটু সময় নেবে, তবু তিন ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

রুণু তার মার হাত ধরে লাফাতে থাকে, চলো মা যাই। চলো মা যাই।

ভাবি একটু দোটানায় পড়ে গেলেন, যাবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু এভাবে হঠাৎ করে এতদূর যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। রুণুকে শান্ত করার জন্যে বললেন, তোর আব্বা আসুক, জিজ্ঞেস করে দেখি।

আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম হোটেলে, আবিদ হাসানের জন্যে। আবিদ হাসান না এসে একটা টেলিফোন করলেন, কী নাকি কাজ পড়েছে, আসতে দেরি হবে। রুণু মাউন্ট রেইনিয়ার যেতে চাইছে শুনে ভাবিকে বললেন ওকে নিয়ে চলে যেতে, আমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।

ভাবি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, গাড়িতে চড়লেই তাঁর একটু পরে পেট্রলের গন্ধে কেমন জানি বমি-বমি লাগতে থাকে। আমায় বললেন রুণুকে

www.MurchOna.com

নিয়ে চলে যেতে। আমাকে জ্বালাতন করতে পারে, আগে থেকে সাবধান করে দিলেন। সেটা শুধুমাত্র কথার কথা। রুণু চমৎকার মেয়ে, জ্বালাতন করা শেখেনি। আমার সাথে মাত্র একদিনের পরিচয়, আমাকে এভাবে বিশ্বাস করে বাচ্চা মেয়েটিকে সারাদিনের জন্যে ছেড়ে দেওয়ায় আমি খানিকটা অভিভূত হয়েছি সত্যি, কিন্তু আমি ঠিক এভাবে রুণুকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম না। সাথে অভিভাবক থাকলে ভালো হয়, শিশুদের নিয়ে আমার একেবারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু রুণুর প্রবল উৎসাহে আমি আর না করতে পারলাম না।

আমি দেরি না করে রুণুকে নিয়ে তখন-তখনই রওনা হয়ে গেলাম। মেয়েটির খুশি দেখে কে! বরফে পাহাড় ঢাকা দেখবে কাছে থেকে, এর থেকে উত্তেজনার ব্যাপার একটা বাচ্চা মেয়ের জন্যে আর কী হতে পারে? রুণুর একটানা কথা শুনতে শুনতে তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে ওঠার সাথে সাথে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটল, মেয়েটি হঠাৎ করে চুপ করে গেল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে কেমন যেন জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে পড়ল কাল রাতেও গাড়িতে উঠে সে ঘুম ভেঙে জ্বলজ্বলে চোখে বসে ছিল। আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রুণু, কী হয়েছে?

সে কোনো কথা বলল না, আবার জিজ্ঞেস করতেই মাথা নেড়ে ইংরেজিতে বলল, কিছু হয়নি।

তার ইংরেজি কথাটি কেমন জানি অদ্ভুত শোনাল আমার কানে। গত দুদিনে তাকে একবারও একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে শুনিনি। বাচ্চা মেয়েটির মুখে স্পষ্ট বাংলা কথা গত দুদিন আমার কানে প্রায় মধুবর্ষণ করে এসেছে। শুধু তা-ই নয়, এই মুহূর্তে সে যে ইংরেজি কথাটি বলেছে, তার উচ্চারণ বিশুদ্ধ আমেরিকান উচ্চারণ। আমি আড়চোখে রুণুকে একবার দেখে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ছোট বাচ্চাদের বোঝা খুব মুশকিল। শহরের ভিড় কাটিয়ে ফ্রী ওয়েতে উঠে গাড়ি ছোটালাম দক্ষিণে।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পর আবার রুণু একটু স্বাভাবিক হয়ে আসে। কথাবার্তা শুরু করে, কিন্তু আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তার কথাবার্তা আর যেন বাচ্চার কথাবার্তা নয়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, কথা বলতে বলতে সে আমাকে ইকবাল চাচা না বলে ডেভিড চাচা বলে ডাকতে থাকে। আমি দুবার শুনে তৃতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রুণু, তুমি আমাকে ডেভিড চাচা ডাকছ?

সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

রুণু আমার দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, কারণ তুমি ডেভিড আইমেল।

শুনে আমি চমকে উঠলাম, আর হঠাৎ কেন জানি ভয় লাগতে থাকে। আস্তে আস্তে বললাম, রুণু, তুমি এসব কী বলছ?

www.MurchOna.com

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ তাকে খুব বিষণ্ন দেখাতে থাকে। একটু পর দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, ইকবাল চাচা, আমার এরকম লাগছে কেন?

কীরকম লাগছে?

জানি না—সে আরও জোরে কেঁদে ওঠে।

আমি গাড়ি চালাতে চালাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, রুণু, চলো আমরা ফিরে যাই আজ। আরেক দিন আমরা সবাই মিলে মাউন্ট রেইনিয়ারে যাব। ঠিক আছে?

সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, না, আজকেই যাব ইকবাল চাচা।

আজকেই যেতে চাও?

হ্যাঁ।

গাড়ি থেকে নেমে একটু হাঁটতে চাও?

রুণু খুব খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ।

বললাম, পেট্রল নেবার জন্যে যখন থামব, তখন তুমি একটু হেঁটে নিও।

রুণু বলল, আর দুমাইল পরেই পেট্রল স্টেশন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কী করে জান?

রুণু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি জানি।

আমি আশা করছিলাম যে দুই মাইল পরে দেখা যাবে কোনো পেট্রল পাম্প নেই, রুণু এমনি কথাটা বলেছে। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ঠিক দুই মাইলের মাথায় একটা পেট্রল পাম্প দেখা গেল। ঠিক জানি না কেন, রুণুর দিকে তাকিয়ে কেন জানি আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

গাড়ি থেকে নেমেই কিন্তু রুণু অন্য মানুষ। ঠিক আগের মতো হৈচৈ করে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে ছুটোছুটি করতে থাকে। কে বলবে গাড়িতে একটু আগে সে এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করেছিল! আমার মনটা হালকা হয়ে আসে।

মিনিট দশেক পর রুণুকে ডেকে বললাম, চলো, গাড়িতে ওঠো।

সে সাথে সাথে কেমন জানি বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কথা না বলে খুব ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠে বসে। আমি দেখলাম, সে শক্ত কাঠ হয়ে গাড়িতে বসে আছে, চোখ দুটি আবার আগের মতো জ্বলজ্বলে।

মাউন্ট রেইনিয়ারে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা তিনটা বেজে গেল। যদি ছুটির দিন হত, এখানে তিলধারণের জায়গা থাকত না। আজ কিন্তু সেরকম ভিড় নেই। গাড়িটা এক জায়গায় পার্ক করে আমি রুণুকে নিয়ে নামলাম। নেমে রুণুর খুশি দেখে কে! মাউন্ট রেইনিয়ার এত সুন্দর একটি পাহাড়, যে না দেখেছে

www.MurchOna.com
===

www.MurchOna.com

তাকে বোঝানো সম্ভব নয়। পাইনগাছের সারির পিছনে ধবধবে সাদা বরফের হিমবাহে ঢাকা একটি অপূর্ব পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় একটি মেঘ আটকে রয়েছে, যেন যাই-যাই করেও যেতে পারছে না।

আমি রুণুকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেলাম। রুণু কখনো তুষার দেখেনি। মাইলখানেক হেঁটে গেলে তুষার দেখা যায়। রুণু যেতে পারবে কি না নিশ্চিত ছিলাম না, কিন্তু সে দিব্যি হেঁটে গেল। পাহাড়ের পাদদেশে ধবধবে সাদা বরফ দেখে তার খুশি দেখে কে! বরফে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলে তার আর আশ মেটে না। ভাবি তাঁদের ক্যামেরাটি হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা দিয়ে তার ছবি তুলে পুরো ফিল্মটা শেষ করে ফেললাম। বেলা পড়ে যাচ্ছিল, একটু আগেও রোদে বেশ তাপ ছিল, এখন হঠাৎ করে ঠাণ্ডা পড়ে যেতে থাকে। আমাদের সাথে সেরকম গরম কাপড় নেই। আমি রুণুকে নিয়ে ফিরে আসতে থাকি। রুণুর নানাকিছু নিয়ে কৌতূহল, আসতে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা হওয়ার আগে ক্যাফেটেরিয়াতে কিছু খেয়ে নিলাম। আজকাল বাইরে খেতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না, রুণু বেচারি অবশ্যি বেশি সুবিধা করতে পারল না। রাতের খাওয়া সারল খানিকটা আলুভাজা—অজ্ঞাত কারণে একে বলা হয় ফ্রেঞ্চফ্রাই, আর একটা আইসক্রীম দিয়ে।

গাড়ির কাছাকাছি এসে রুণু হঠাৎ কেমন জানি বিবর্ণ হয়ে যায়। আমার হাত ধরে বলল, আমি গাড়িতে উঠতে চাই না ইকবাল চাচা।

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, কেন রুণু?

আমার ভালো লাগে না।

কেন?

আমি জানি না।

ওকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে গাড়িতে তুললাম। গাড়িতে উঠেই সে শান্ত হয়ে গেল, আবার জ্বলজ্বলে চোখে সোজা হয়ে কাঠের মতো বসে রইল, মুখে আর একটি কথাও নেই। আমি স্টার্ট নেবার আগে সে হঠাৎ পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, রাস্তায় একটু থেমো ডেভিড।

আমার হঠাৎ কী মনে হল জানি না, ড্যাশবোর্ডটা খুলে গাড়ির পুরানো কিছু কাগজপত্র বের করলাম। আগের মালিকের নাম-ঠিকানা লেখা একটি পুরানো রেজিস্ট্রেশন ফরম দেখেছিলাম একসময়। ফরমটি খুঁজে পেলাম, সেখানে গাড়ির আগের মালিক হিসেবে দুজনের নাম লেখা রয়েছে, ডেভিড আইমেল এবং তার স্ত্রী ক্যাথি আইমেল। আমি কাগজগুলি তুলে রেখে ভয়ে ভয়ে রুণুর দিকে তাকালাম। সে জ্বলজ্বলে চোখে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে তাকাতে দেখে ইংরেজিতে বলল, চলো, ডেভিডকে রাস্তা থেকে তুলে নিতে হবে।

www.MurchOna.com

ডেভিডকে?

হ্যাঁ।

ডেভিড কে?

ডেভিড আইমেল।

আমি জানি খুব নির্বোধের মতো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবু জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, তোমার নাম কি রুণু?

রুণু শান্ত স্বরে বলল, ক্যাথি। ক্যাথি আইমেল।

আমি নিশ্বাস আটকে রেখে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। খোদা, ভালোয়-ভালোয় পৌঁছে দাও আমাকে এবারে।

পাহাড়ে হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে, এবারও তা-ই হল, হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। গাড়ির হেডলাইট ছাড়া আর কোনো আলো নেই, আঁকাবাঁকা রাস্তায় সেই আলো যেন অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে গাড়ি ছুটিয়ে নিতে থাকি।

পাশের সীটে রুণু বসে আছে চুপচাপ। আমি শুনতে পাই আস্তে আস্তে সে যেন কেমন টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে শুরু করেছে। আমি আড়চোখে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। আস্তে আস্তে ডাকলাম, রুণু—

কোনো উত্তর নেই।

গলা উঁচিয়ে বললাম, রুণু, কী হয়েছে তোমার?

হঠাৎ রুণু তীব্রস্বরে চিৎকার করে ইংরেজিতে বলল, চুপ করো নির্বোধ কোথাকার!

আমি চমকে উঠি, গলার স্বরটা অচেনা, তীক্ষ্ণ রিনরিনে একটি গলার স্বর। আমি একটি কথাও না বলে গাড়ির এক্সেলেটারে চাপ দিই। আশেপাশে কোনো জনমানুষ নেই, দুই পাশে ঘন জঙ্গল। আমি গুলির মতো ছুটছি, হঠাৎ করে একটা আতঙ্ক এসে ভর করেছে আমার উপর।

হঠাৎ রুণু আবার রিনরিনে গলার স্বরে চিৎকার করে ওঠে, থামাও, গাড়ি থামাও।

কেন?

ডেভিডকে তুলতে হবে।

কোথায় ডেভিড?

ওই যে—

হাত তুলে দেখায় সে, আর আতঙ্কিত হয়ে দেখি দূরে রাস্তার পাশে সত্যি ছায়ার মতো কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি দাঁতে দাঁত কামড়ে এক্সেলেটারে চাপ দিলাম, পাহাড়ের বাঁকে আশি মাইলে গাড়িটা ঘুরে বের হয়ে গেল। শুনতে পেলাম রুণু তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকতে শুরু করেছে। মুখ

www.MurchOna.com

থেকে অশ্রাব্য ইংরেজি গালি বের হয়ে এল তার। প্রলাপের মতো কথা বলতে বলতে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদতে থাকল সে।

দূরে হঠাৎ সেই পেট্রল পাম্পটি দেখতে পেলাম। আমার বুকে সাহস ফিরে এল। কাছে এসে দেখি পেট্রল পাম্পটি বন্ধ করে লোকজন চলে গেছে। গাড়িটি না থামিয়ে আবার সোজা পথে উঠে পড়লাম। রুণু হঠাৎ করে কান্না থামিয়ে সামনের দিকে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, ডেভিড।

আমি ঢোক গিলে বললাম, কোথায়?

সামনে। গাড়ি থামাবে তুমি?

এক্সেলেটারে চাপ দিলাম আমি, গাড়ির গতি হঠাৎ বেড়ে গেল। দূরে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল, দুহাত উপরে তুলল অনেকটা আশীর্বাদের মতো।

প্রাণপণে হর্ন দিলাম আমি, কিন্তু লোকটি দাঁড়িয়েই রইল। পাশ কাটিয়ে যাব কি আমি? একটু অসতর্ক হলে অতল খাদে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। প্রায় চোখ বন্ধ করে পাশ কাটিয়ে গেলাম আমি, সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে ছিল কোনো-একটি আঘাতের জন্যে। কিন্তু কিছু হল না। আমি নিশ্বাস আটকে রুণুর দিকে তাকালাম, সে কি আবার অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে শুরু করবে?

রুণু কিছু বলল না। আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর বলল, আমি এখন যাব।

কোথায়?

ডেভিডের সাথে।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

রুণু আবার বলল, আমি এখন যাব ডেভিডের সাথে। তুমি ডেভিডকে তার গাড়ি চালাতে দাও।

আমি কোনো কথা বললাম না।

দাও ডেভিডকে।

কোথায় ডেভিড?

এই তো। রুণু হাত দিয়ে পিছনে দেখায়।

আমি দেখব না দেখব না করেও পিছনে তাকাই। আবছা অন্ধকারে দেখতে পাই গাড়ির পিছনের সীটে কে যেন বসে আছে, মাথার চুল ভেজা, চোখ দুটিতে স্থির দৃষ্টি।

চিৎকার করে সামনে তাকাতেই দেখি গাড়িটি তাল হারিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। পিছন থেকে কে যেন খলখল করে হাসতে শুরু করল হঠাৎ।

কী যেন হঠাৎ একটা ঘটল আমার, মনের ভিতরে কে যেন বলল, বাঁচতে হবে, তোমার বাঁচতে হবে—যেভাবে হোক বাঁচতে হবে। ব্রেকে পা দিলাম

www.MurchOna.com

প্রাণপণে, প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়িটা তাল হারিয়ে ঘুলে গেল, কোথায় জানি ধাক্কা লাগে একবার, তারপর আরেকবার, তারপর আরেকবার। গাড়িটা পুরোপুরি উলটে যায় এবারে, পড়ে যাচ্ছে অতল খাদে। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল। ইঞ্জিনটা চলছে তখনও। উচ্চস্বরে কে যেন হাসছে গাড়ির পিছনে, রুণু প্রাণপণে চিৎকার করছে, ডেভিড, আমার ডেভিড—

প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে কোথায় যেন, ধরতে পারছি না, কিন্তু যন্ত্রণায় নিশ্বাস নিতে পারছি না আমি। সারা গাড়ি ভরে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। এখন কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে যাবে এই গাড়ি? জ্ঞান হারাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু অনেক কষ্ট করে একটা ঘোরের মাঝে থেকে ফিরে এলাম। বাঁচতে হবে আমাকে, রুণুকেও বাঁচাতে হবে। হাতড়ে হাতড়ে রুণুকে খুঁজে বের করি পাশের সীটে, কোনোরকমে সীটবেল্ট খুলে তাকে টেনে আনি নিজের দিকে, তারপর দুজনে দরজা খুলে টেনে-হিঁচড়ে বের হয়ে আসি গাড়ি থেকে। পেট্রলের তীব্র গন্ধ এসে লাগে নাকে। ইঞ্জিনটা চলছে কেন এখনও?

আমি রুণুকে জাপটে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে থাকি, পায়ের কোথাও ভেঙে গেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাব যে-কোনো মুহূর্তে। তার মাঝে আমি সরে যেতে থাকি এই অশুভ গাড়ি থেকে, যতদূর সম্ভব। প্রায় দুশো ফুট দূরে গিয়ে আমি থামলাম, আর ঠিক তক্ষুনি গাড়িটাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল। আগুনের লকলকে শিখায় দেখতে পেলাম গাড়ির পিছনের সীটে বসে কে যেন উল্লাসে নৃত্য করছে। সত্যি দেখছি আমি, নাকি আমার চোখের ভুল?

রুণু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, ইকবাল চাচা, তুমি কেন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে? কেন?

আমি তাকে ছেড়ে যাইনি, কিন্তু সেটা নিয়ে আর কথা বললাম না, শক্ত করে ধরে বললাম, আর কখনো তোমাকে আমি ছেড়ে যাব না, রুণু, কখনো যাব না।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

মৃগাবালী

কলেজে পড়ার সময় আমাদের এক বন্ধু একদিন ফুটপাত থেকে একটা বই কিনে আনল। বইটার নাম 'জন্মান্তর রহস্য'। সাধু ভাষায় লেখা বই, পড়তে রীতিমতো কষ্ট হয়, তবু সবাই মিলে আমরা বইটা পড়ে ফেললাম। বইটিতে নানারকম ভৌতিক গল্প ছাড়াও কেমন করে মৃত মানুষের আত্মাকে নিয়ে আসা যায় সেটি পরিষ্কার করে লেখা আছে। পড়ে মনে হল ব্যাপারটি এমন-কিছু কঠিন নয়। রাত্রিবেলা কয়েকজন মিলে অন্ধকার ঘরে গোল হয়ে বসে একজন আরেকজনের হাতের ওপর হাত রেখে একটা গোল 'চক্রে' বসে গভীরভাবে মৃত মানুষের কথা ভাবলেই নাকি আত্মার আবির্ভাব হয়। আত্মা একজন মানুষের উপর আসবে, তার মুখ দিয়ে কথা বলবে। চক্রে বসার আগের ঘরটা পরিষ্কার করতে হয়, নিজে গোসল করে ধোয়া কাপড় পরতে হয়, লঘুপাক খাবার খেতে হয় ইত্যাদি নানারকম বিধিনিষেধ আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপারটি চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে হোস্টেলে থাকি বলে খাবারে কোনো হাত নেই। লঘুপাক গুরুপাক যেটাই দেয় সেটাই খেতে হয়।

সবাই মিলে ঠিক করলাম একদিন ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখতে হয়। ব্যাপারটা বেশি জানাজানি না করে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন একদিন রাতে মৃত আত্মাকে ডাকার জন্যে একত্র হলাম। গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরে এসেছি। টিপু দাবি করল তার বিছানার চাদর মাত্র ধোয়া হয়েছে, কাজেই তার বিছানাতেই বসা হল। বইয়ের কথা অনুযায়ী একজনের হাতের উপর আরেকজনের হাত রেখে ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হল।

এরপর গভীর মনোযোগের সাথে পরকালের কথা ভাবার কথা। ব্যাপারটা সহজ নয়, ঘুরেফিরে শুধু ইহকালের কথা মনে আসে, রাতে কী খেয়েছি, বাসায় চিঠি লেখা হয়নি, ভালো একটা সিনেমা এসেছে এইসব। প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টা করে আমরা হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম, হঠাৎ করে টিপু আমার হাতে চিমটি কাটল।

www.MurchOna.com

মৃত আত্মা আসার সময় শরীর কাঁপতে থাকার কথা, নিশ্বাস দ্রুত হওয়ার কথা, কিন্তু কখনোই চিমটি কাটার কথা না। সম্ভবত টিপু কিছু-একটা সংকেত দিতে চাইছে। টিপু আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তার মতো পাজি মানুষ বেশি তৈরি হয়নি। আমার সন্দেহ হল সে কিছু-একটা বদ মতলব ভেবে বের করেছে। অন্ধকারে আন্দাজ করে তার কাছে মাথা নিয়ে গেলাম, টিপু ফিসফিস করে বলল, মজা দেখার জন্য রেডি হ।

মৃত আত্মার আবির্ভাব আর যা-ই হোক, মজা হতে পারে না। তা ছাড়া টিপুর কাছে যেটা মজা মনে হয় আমি তার থেকে শত হস্ত দূরে থাকার চেষ্টা করি। মজাটা কী হতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ দেখি টিপুর হাতকাঁপা শুরু হয়েছে। টিপুর অন্য পাশে বসেছিল রেজা, সে ভয়ার্ত গলায় বলল, সর্বনাশ, এসে গেছে!

সাথে সাথে আমি বুঝে গেলাম টিপু কী করতে চাইছে—মৃত আত্মার আবির্ভাবের একটা অভিনয় করে দেখাবে। আমি এখনই পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ে টিপুকে নিবৃত্ত করতে পারি। কিংবা ইচ্ছা করলে টিপুর সাথে তাল মিলিয়ে মৃত আত্মার আবির্ভাবটিকে আরও জলজ্যান্ত করে তুলতে পারি। আমি টিপুর সাথে তাল মিলিয়ে যাওয়াই ঠিক করলাম। টিপু পাজি মানুষ সত্যি, কিন্তু আমিও ধোয়া তুলসীপাতা নই। গলার স্বর গম্ভীর করে বললাম, কোনো কথা নয়, আত্মার কষ্ট হতে পারে। সবাই পরকালের কথা ভাবো।

ঘরে কোনো শব্দ নেই, নিঃসন্দেহে সবাই প্রচণ্ড মনোযোগে পরকালের কথা ভাবা শুরু করেছে। টিপুর হাতকাঁপাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে, আস্তে আস্তে গলা থেকে একটা বিকট আওয়াজ বের হতে শুরু করে। আমি বইয়ের নির্দেশমতো জিজ্ঞেস করলাম, হে বিদেহী আত্মা, আপনি এসেছেন?

টিপু গোঙানোর মতো একটা শব্দ করল, যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না দুই-ই হতে পারে।

রেজা কাঁপা গলায় বলল, ভয় লাগছে আমার। বন্ধ করে দে—

আমি বললাম, বন্ধ করব কী? একটা আত্মা এসেছে, কথা বলব না?

আপত্তি করলে ভীতু হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাই কেউ বেশি আপত্তি করল না।

আমি আবার বিনয়ে গলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

টিপু বিকট গলায় বলল, কী কথা?

আপনার নাম কী?

নাম দিয়ে কী করবি?

www.MurchOna.com

আপনি কোথায় থাকেন?

এত কেন কৌতূহল?

প্রশ্নের উত্তর যখন প্রশ্ন দিয়ে হয়, সেই কথোপকথন বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় না। আমি তবু চেষ্টা করলাম, আপনি কীভাবে মারা গিয়েছিলেন? টিপু উত্তর না দিয়ে গোঙানোর মতো একটা শব্দ করতে শুরু করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ। অনেক কষ্ট, অনেক কষ্ট—এই বলে টিপু মাথা নিচু করে উৎকট শব্দ করতে শুরু করে, মনে হয় কেউ বুঝি পিছন থেকে ক্রমাগত ছোরা মারছে। ঘরের অনেকেই এবারে ভয় পেয়ে গেল, রেজা বলল, আর নয়। এখন বন্ধ করে দিই।

টিপুও বলল, আমি যাব। আমি যাব—

আমি বললাম, ঠিক আছে আপনি যান।

টিপু শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে বলল, আমি যেতে পারছি না—যেতে পারছি না—

কেন?

তোরা আমাকে আটকে রেখেছিস। যেতে দে, আমাকে যেতে দে—টিপু করুণ সুরে কাঁদতে শুরু করে।

ভয়-পাওয়া গলায় একজন বলল, যেতে পারছে না কেন?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, চক্রে বাঁধা পড়ে গেছে। হাত ছেড়ে চক্র ভেঙে দিলেই চলে যাবে। সবাই হাত ছেড়ে দাও।

সবাই হাত ছেড়ে দিল, আর সত্যি সত্যি টিপু ভালোমানুষের মতো সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

ঘরের বাতি জ্বালানো হল। উত্তেজনায় কেউ কথা বলতে পারছে না। রেজা তোতলাতে তোতলাতে বলল, তু-তু-তুই জানিস না?

কী জানি না?

তোর উপর আত্মা এসেছিল।

আমার উপর? টিপু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকায়—আমার উপর?

হ্যাঁ।

সত্যি?

সত্যি।

খোদার কসম?

খোদার কসম। তোর কিছু মনে নেই?

নাহ্। মনে হল ঘুমের মতন—তারপর কিছু মনে নেই।

বিস্ময়ে কারও মুখে কথা ফোটে না।

www.MurchOna.com

টিপুর এই দুষ্কর্মের ফল হল ভয়ানক। পরদিন সারা হোস্টেলে ঘটনাটির কথা ডালপালা গজিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে হোস্টেলের ছেলেরা একের পর এক এসে সত্যি কী হয়েছিল জানার চেষ্টা করতে থাকল। বিকেলের দিকে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠলাম এবং সন্ধের পর যখন প্রায় সারা হোস্টেলের ছেলেরা টিপুর ঘরে স্বচক্ষে ভূত দেখার জন্যে হাজির হল, আমি প্রমাদ গুনলাম।

এত লোকের ভিড়ে আমার চক্রে বসার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কয়েকজনকে বোকা বানানো মজার ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু ঘরভরতি মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করায় বিপদের ঝুঁকি আছে। চক্রে বসতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, ঘর নিরিবিলি হতে হয়, মন পবিত্র থাকতে হয় এরকম বড় বড় কথা বলে বেশিরভাগ উৎসাহী দর্শককেই ভাগিয়ে দেওয়া গেল। তবু জনাবিশেক কিছুতেই নড়ল না, তারা স্বচক্ষে আত্মার আবির্ভাব না দেখে নড়বে না। তাদের উৎসাহেই আবার চক্রে বসতে হল—টিপু আবার আগের মতো অভিনয় করে দেখাবে, সবাই খুশি হয়ে ঘরে ফিরে যাবে, আমার সেরকমই ধারণা ছিল। কিন্তু দেখা গেল আজ টিপুর সেরকম কোনো ইচ্ছা নেই। ঘর তখন মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেছে, যারা তখনও ধৈর্য ধরে বসে আছে তাদের মাঝে একজন হচ্ছে নুরুল। নুরুল মফস্বলের ছেলে, কাজেই আমাদের মতো চালবাজ ধরনের শহুরে ছেলেদের সাথে তার বেশি যোগাযোগ নেই। আমরা আড়ালে নুরুল এবং তার মতো মফস্বলের ছেলেদের 'ক্ষেত' বলে ডাকি।

নুরুল ধৈর্য ধরে বসে রইল, ওঠার কোনো নাম নেই। তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন তবু বসে রইল। অন্য সবাই হাল ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু রেজা বাদ সাধল। সে বলল, জন্মান্তর রহস্য বইটিতে সে পড়েছে চক্রে যদি আত্মার আবির্ভাব না হয় তা হলে পরকাল নিয়ে আলোচনা বা ভৌতিক ঘটনার উল্লেখ করলে অনেক সময় আত্মার দ্রুত আবির্ভাব হয়ে থাকে। গালগল্পে আমার জুড়ি কম, তাই আমাকেই ভৌতিক ঘটনা বর্ণনার দায়িত্ব নিতে হল। কিছুদিন আগে একটা বিদেশি ভূতের গল্প পড়েছিলাম, গোরস্তান থেকে মৃত মানুষ উঠে-আসাসংক্রান্ত ভয়াবহ একটা গল্প। গল্পটির সব চরিত্রগুলিকে আমার মামাবাড়ির বিভিন্ন চরিত্রে পালটে দিয়ে সবার সামনে সেটি ফেঁদে বসলাম। গল্পটি ভয়ংকর একটি গল্প, অন্ধকার ঘরে সেটি সবার ভিতর একটা জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। গল্প শেষ করে আবার যখন আমরা চক্রে বসলাম আমার নিজেরই কেমন একটা সন্দেহ হতে শুরু করল যে, হয়তো এবারে সত্যি একটা আত্মার আবির্ভাব ঘটে যাবে। কিন্তু তখন যে-জিনিসটি ঘটল তার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না।

পাশের বিছানায় আরও কয়েকজনের সাথে নুরুল বসে ছিল, সে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধড়াম করে বিছানার উপর পড়ে গেল। অন্ধকারে প্রথমে আমরা

প্রচণ্ড একটা শব্দ, তারপর সবার গগনবিদারী চিৎকার শুনতে পেলাম। ঘরটায় হঠাৎ একটা অচিন্তনীয় আতঙ্কের সৃষ্টি হল এবং হাতের কাছে লাইটের সুইচটা থাকা সত্ত্বেও সেটা জ্বালাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত যখন ঘরে আলো জ্বালানো হল, দেখা গেল বিছানায় নুরুল উপুড় হয়ে আছে, বেকায়দা পড়ে মাথার পাশে খানিকটা কেটে গেছে, সেখান থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য, সেটা হচ্ছে তার শরীরের কাঁপুনি। একজন মানুষের শরীর যে কখনো এভাবে কাঁপতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না।

আমরা ধরাধরি করে নুরুলকে চিত করে শোয়ালাম। তার চোখ বন্ধ, কিন্তু শরীর তখনও থরথর করে কাঁপছে। মাথার পাশে যেখানে কেটে গেছে, সেখানে একটা রুমাল চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করে আমি ডাকলাম, নুরুল, এই নুরুল!

নুরুল পুরোপুরি অচেতন। আমার কথা তার কানে গিয়েছে বলে মনে হল না। দেখে আমার মনে হল, সে হয়তো মরেই যাচ্ছে। আমি আবার ডাকলাম, নুরুল, এই নুরুল!

নুরুল বিড়বিড় করে কী-একটা বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি আবার ডাকলাম, তখন হঠাৎ নুরুল ভারী গলায় বলল, ছেলেটাকে ধরে রাখো।

আমি চমকে উঠলাম, কার গলার স্বর এটা? ঢোক গিলে বললাম, কোন ছেলেটাকে?

এই ছেলেটাকে। দেখছ না কেমন কাঁপছে।

হঠাৎ করে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম, নুরুল তার নিজেকে ধরে রাখার কথা বলছে। আমি ভয়ে ভয়ে গিয়ে নুরুলকে চেপে ধরলাম। আমার দেখাদেখি টিপু এবং রেজাও এগিয়ে এল। নুরুলের সারা শরীর এত জোরে জোরে কাঁপছে যে, আমরা তিনজন মিলেও তাকে ধরে রাখতে পারি না। আমি ভয়-পাওয়া গলায় বললাম, নুরুল, কী হয়েছে তোর?

নুরুল সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষের গলায় বলল, শক্ত করে ধরে রাখো। ছেলেটার অনেক কষ্ট হচ্ছে।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আপনি কে?

নুরুল চোখ বন্ধ রেখেই ভারী গলায় বলল, আমি মুগাবালী, একটু থেমে নিজেই যোগ করল, আমি একজন জিন।

আলোকোজ্জ্বল ঘরে এতজন মানুষের উপস্থিতিতেও একটা অশরীরীর আতঙ্কে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। শুধু আমার নয়—সবার, কারণ রেজা আর টিপু নুরুলকে ছেড়ে দিয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেল। আমি একা নুরুলকে ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু তবু তারা এগিয়ে এল না।

www.MurchOna.com

আমি সাহসে ভর করে আস্তে আস্তে বললাম, আপনি এখন যান।

নুরুল একটা বিচিত্র শব্দ করল, অনেকটা হাসির মতো শব্দ, তারপর বলল, আমি যাব না।

কেন যাবেন না?

নুরুলের মুখ দিয়ে সেই অশরীরী প্রাণীটি উত্তর দিল, আমি এই ছেলেটাকে নিয়ে যাব।

শুনে আতঙ্কে আমাদের সবার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। সত্যিই যদি নুরুলকে নিয়ে যায়? সত্যি যদি তাকে মেরে ফেলে? কী সর্বনাশ!

জন্মান্তর রহস্য বইয়ে লেখা ছিল বিদেহী আত্মার আবির্ভাব হলে যখন তাকে চলে যেতে বলা হয় সে নিজে থেকেই চলে যায়। হঠাৎ হঠাৎ কখনো একটি দুটি দুষ্ট আত্মার আবির্ভাব হয়, তারা নিজে থেকে যেতে চায় না। তখন তাদের বিদেয় করার জন্যে ঘরের সব বাতি জ্বালিয়ে দিতে হয়, যার উপর আর্বিভাব হয়েছে তার মুখে পানির ঝাপটা দিতে হয়। ঘরে ইতিমধ্যে সব আলো জ্বালানো হয়ে গেছে, আমি আলি রেজাকে বললাম এক গ্লাস পানি আনার জন্যে। পানি এনে নুরুলের মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া হল, কিন্তু কোনো লাভ হল না। নানির কাছে শুনেছিলাম আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁ দিলে জিন-ভূত থাকতে পারে না। নিজেদের মুখস্থ নেই, একজনকে জোগাড় করা হল যার মুখস্থ আছে, তাকে দিয়ে নুরুলের কানে আয়াতুল কুরসি পড়া হল, কিন্তু তবু লাভ হল না। উলটো মুগাবালী নুরুলের মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বলা শুরু করল। কথার বিষয়বস্তু খুব বিচিত্র। একটা বড় অংশ নুরুলকে নিয়ে—যাকে সে এই ছেলেটা বলে সম্বোধন করছে। বারবার বলছে ছেলেটা খুব দুঃখী এবং তাকে সে সাথে নিয়ে গিয়ে সব দুঃখের অবসান করতে চায়।

আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর আমরা প্রকৃত বিপদটুকু টের পেলাম। যদি আমরা নুরুলকে এই জিন থেকে ছুটিয়ে আনতে না পারি এবং এই খবর হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট পর্যন্ত পৌছায়, তা হলে আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। এর থেকে অনেক ছোট অপরাধের জন্যে মাসখানেক আগে একজনকে হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করলাম। সবকিছু অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়, যদিও ব্যাপারটা নিজের জন্যে সম্মানজনক নয়। পির-ফকিররা ঝাড়ফুঁক দিয়ে জিন নামায় বলে শুনেছি, কিন্তু এই মধ্যরাতে আমি পির-ফকির খুঁজে পাব কোথায়? একমাত্র যে-জিনিসটি করা যায় সেটি হচ্ছে নুরুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। ডাক্তারদের জিন নামানো শেখানো হয় বলে শুনিনি, কিন্তু কিছু-একটা তো করতে হবে!

www.MurchOna.com

টিপু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, কী করা যায়?

হাসপাতালে নেওয়া ছাড়া তো আর কোনো পথ দেখি না।

হাসপাতাল? কেমন করে নিবি?

সুপারিনটেনডেন্ট স্যারকে ডেকে তুলে হাসপাতালে ফোন করতে হবে।

টিপু চোখ কপালে তুলে বলল, তোর মাথা-খারাপ হয়েছে?

আমি বললাম, তা হলে কী করবি?

টিপু খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, কী অবস্থা হবে জানিস?

কিন্তু উপায় কী?

নুরুল তখনও খলখল করে হাসছে। বলছে, কী করবে তোমরা? হাসপাতালে পাঠাবে? হা হা হা! গোরস্তানে পাঠাও, গোরস্তানে। হাসপাতালে না।

নুরুলকে দেখে আর কারও অপেক্ষা করার সাহস হল না। টিপু সাথে আরেকজনকে নিয়ে সুপারিনটেনডেন্ট স্যারকে ডাকতে গেল। রাত দুটোর সময় হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টকে ডেকে তুলে কীভাবে এই খবরটি দেওয়া যায় আমার জানা নেই, কিন্তু টিপু যে-কায়দা ব্যবহার করল তার তুলনা নেই। স্যারের বাসার দরজা সে লাথি মেরে প্রায় ভেঙে ফেলার অবস্থা করে তাকে ঘুম থেকে তুলল। লুঙ্গিতে গিঁট মারতে মারতে স্যার যখন উঠে এলেন, টিপু তাঁকে বলল, কী দেখে ভয় পেয়ে নুরুল মরে গেছে।

একজন হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের জীবনে এর থেকে ভয়ংকর কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না—তিনি পাগলের মতো ছুটে এসে যখন দেখলেন নুরুল তখনও মরেনি, তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তক্ষুনি হাসপাতালে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনালেন। পনেরো মিনিটের ভিতর সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির হল, সারা হোস্টেলের ছেলেদের ঘুম থেকে জাগিয়ে স্ট্রেচারে করে নুরুলকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। সঙ্গে গেলাম আমি, হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাথে যেতে চাইছিলেন, অনেক বুঝিয়ে তাঁকে রাখা হল। অন্যদের দায়িত্ব হল ঘটনাটি ঠিকভাবে তাকে বোঝানো।

হাসপাতালের ডাক্তার একটা কমবয়সী ছেলের মতো। নুরুলকে টিপেটুপে দেখে আমার দিকে তাকাল। আমি জিনের কথা বলতেই সে এত জোরে হাসা শুরু করল যে আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট চেপে ধরে সিরিঞ্জে কী-একটা ওষুধ ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, এই বয়সে এত নেশা ভাঙ শুরু করা ঠিক না।

আমি আপত্তি করে কী-একটা বলতে চাইছিলাম, ডাক্তার বাধা দিয়ে বলল, গল্প বানাতে চাও বানাও, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য গল্প তো বানাবে! রাত তিনটার সময় যদি বল জিনে ধরেছে—হাঃ হাঃ হাঃ।

আমি বললাম, বিশ্বাস করেন, সত্যি জিনে ধরেছে।

www.MurchOna.com
==

www.MurchOna.com

ডাক্তার আমার কথায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল, কী নাম বললে? মসুরালী?

না, মুগাবালী।

মুগাবালী! হাঃ হাঃ হাঃ! খাসা নামটা দিয়েছ!

আমি কাতর গলায় বললাম, বিশ্বাস করেন, সত্যি জিনে ধরেছে।

ডাক্তার মুখে কৃত্রিম একটা গাম্ভীর্য এনে বলল, ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু কোনো ভয় নেই। পেথিড্রিন দিয়ে দিচ্ছি। পেথিড্রিনের ওপরে ওষুধ নেই। জিন ভূত রাক্ষস-খোক্কস সব পালাবে। এই দ্যাখো—বলে ডাক্তার খোঁচ করে সিরিঞ্জের সুচটা নুরুলের হাতে ঢুকিয়ে দিল।

পেথিড্রিনের ফল না অন্য কোনো কারণ আমি জানি না, নুরুল কিছুক্ষণের মাঝেই শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ডাক্তার ঘুরে এসে তাকে একবার দেখে বলল, তুমি আর থেকে কী করবে? বাড়ি যাও।

আমি ভোর চারটার সময় হোস্টেলে ফিরে এলাম।

নুরুল পরের দিনই সুস্থ হয়ে ফিরে এল। মুগাবালী জিন বা অন্য কোনো-কিছুই তার মনে নেই। আমরা তাকে আর বেশি ঘাঁটালাম না। কারণ একদিনেই তার চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। মুখ রক্তশূন্য এবং চেহারার মাঝে কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভাব।

চক্রে বসে আত্মার আবির্ভাব করানোর চেষ্টা আমাদের সেইদিন থেকেই ইতি। ভৌতিক কারণ থেকেও বড় কারণ হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি বলে দিয়েছেন, হোস্টেলে এ-ধরনের কোনো ঘটনা আবার ঘটলে যারা যারা এ-ব্যাপারে জড়িত থাকবে তাদের সবাইকে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হবে।

এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। নুরুলের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, কিন্তু যতবারই দেখি আমার কেমন জানি অস্বস্তি হয়। তার ভেতরে কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে, মুখেচোখে কেমন জানি একটা ছন্নছাড়ার মতো ভাব, কাপড়-জামা অগোছালো, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মতো। আমি একদিন নুরুলকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নুরুল, তোর কী হয়েছে?

নুরুল ভীষণ চমকে উঠে বলল, না না, কিছু হয়নি।

সত্যি করে বল।

সত্যি বলছি। খোদার কসম। তারপর প্রায় দৌড়ে আমার কাছ থেকে সরে গেল।

আমি ঠিক করলাম, তার রুমমেটকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সে নিশ্চয়ই বলতে পারবে নুরুলের সত্যিই অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে কি না। তার রুমমেটের

www.MurchOna.com

নাম জলিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে প্রায় মাসখানেক হল বাড়ি গেছে, কোনো-একটা পারিবারিক জটিলতার জন্যে আসতে পারছে না। অনেকে সন্দেহ করছে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতত নুরুল একাই আছে তার রুমে।

আমার ভিতরকার অস্বস্তিটা আরও দানা বেঁধে উঠতে থাকে, কিন্তু আমি কী করব বুঝতে পারলাম না।

আরও কয়দিন কেটে গেল তারপর। আমি আবার একদিন খোঁজ নিতে গেলাম। নুরুলের রুম ভিতর থেকে বন্ধ। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ধাক্কা দেবার পর নুরুল দরজাটা একটু খুলে আমার দিকে তাকাল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ভিতরে অন্ধকারে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে বিড়ালের মতো।

আমি একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নুরুল, কী ব্যাপার?

কিছু না। বলে নুরুল প্রায় আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে পাশের রুমে যারা আছে তাদের কাছে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলাম। বেশির ভাগই ক্লাসে চলে গেছে, পাওয়া গেল কিংকং নামের কমার্সের পেটরোগা ছেলেটিকে। তার দুর্বল স্বাস্থ্যকে উপহাস করে নববর্ষে তাকে কিংকং উপাধি দেওয়া হয়েছিল। উপাধিটা কীভাবে জানি আটকে গেছে, আজকাল কেউ তার সত্যিকার নামটা মনেও করতে পারে না।

কিংকং আমাকে জানাল, গভীর রাতে নুরুলের রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে তাকে প্রায়ই একা একা কথা বলতে শোনে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা?

কিংকং বলল, জানি না। মাঝে মাঝে যখনই শোনার জন্যে বাইরে দাঁড়াই ভিতর থেকে কীভাবে জানি বুঝে যায়, তখন কথা বন্ধ করে দেয়। একবার শুধু শুনেছি—

কী?

শুনেছি নুরুল বলছে, না-না যাব না।

কিংকংয়ের সাথে কথা বলে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপারটি অন্যদের সাথে আলোচনা করতে হবে। কে জানে হয়তো সুপারিনটেনডেন্টকে জানাতে হবে। কিন্তু সবার আগে নুরুলের সাথে কথা বলা দরকার।

অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পর নুরুল আবার দরজা একটু খুলে বাইরে উঁকি দিল। আমি তাকে প্রায় ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে এই দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার, দরজা-জানালা পুরোপুরি বন্ধ। ঘরের এক কোনায় কয়টা আগরবাতি জ্বলছে, আর একটা অস্বস্তিকর গন্ধ ভিতরে। আমি নুরুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছিস কেন?

না, মানে ইয়ে—নুরুল অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল।

তুই নাকি কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস?

www.MurchOna.com

না, যাই তো! কে বলেছে যাই না?

ঠিক করে বল তো কী হয়েছে।

কিছু হয়নি।

বল আমাকে। না হলে আমি কিন্তু সুপারিনটেনডেন্টকে জানাব।

নুরুল কাতর-মুখে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার বড় বিপদ।

কী হয়েছে?

রাত্রিবেলা সে আসে।

কে?

ঐ যে আরেকবার এসেছিল।

কে?—জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

মুগাবালী।

মুগাবালী! সেই জিন?

হ্যাঁ।

কীভাবে আসে?

এমনি এসে যায়।

এসে কী করে?

এসে বসে থাকে। আমাকে নিয়ে যেতে চায়।

কোথায় নিতে চায়?

জানি না। শুধু বলে আমার সাথে চল। আমার খুব ভয় করে।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তুই আমাদের আগে বলিসনি কেন?

বলে কী হবে!

দেখব শালার মুগাবালী কীভাবে আসে। ঠ্যাং ভেঙে ফেলে দেব না!

এই প্রথমবার নুরুলের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে। আমি বললাম, তুই খবরদার ভয় পাবি না। আজ থেকে আমরা কয়েকজন তোর ঘরে থাকব। তোর কোনো ভয় নেই।

সত্যি থাকবি? নুরুলের চোখে কাতর অনুনয় দেখে আমার প্রায় বুক ভেঙে গেল। বললাম, থাকব। দেখে নেব শালার মুগাবালীকে!

সেদিন থেকে আমরা কয়েকজন মিলে নুরুলের ঘরে রাত কাটাতে শুরু করলাম। জিনকে লাঠি দিয়ে ঠ্যাঙানো যায় বলে শুনিনি, কিন্তু তবু ঘরে দুটো হকিস্টিক রাখা হল।

নুরুলের সাথে থাকার ফল হল সাথে সাথে, তার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। তার হতচ্ছাড়া ভাব কেটে একটা হাসিখুশির ছোঁয়া লাগে। আবার নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া শুরু করে সে।

www.MurchOna.com

প্রথম সপ্তাহ যাবার পর কয়েকজন থাকার বদলে পালা করে শুধু একজন করে থাকা শুরু করলাম। নুরুলের রুমমেট জলিলের একটা চিঠি এল। তার বিয়ে হয়নি, অন্তত চিঠিতে তার উল্লেখ নেই। সে এসে যাবে কয়েকদিনের মাঝেই, তখন আর আমাদের নুরুলের সাথে থাকতে হবে না। মৃগাবালীর ব্যাপারটা সত্যি না নুরুলের মনগড়া জানার উপায় নেই, কিন্তু ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়েছে, সেটাই বড় কথা।

দিন দশেক পরের কথা। আমার সে-রাতে নুরুলের ঘরে শোবার কথা। সেকেন্ড শোতে একটা সিনেমা দেখে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেছে। এত রাতে নিজের বিছানা ছেড়ে বালিশ, চাদর নিয়ে নুরুলের ঘরে যাবার কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তবু গেলাম। দরজা ধাক্কা দেবার সাথে সাথে নুরুল দরজা খুলে দিল, মনে হল সে যেন দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। নুরুলের মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, মরা মানুষের মতো সাদা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নুরুল, কী হয়েছে?

না না না, কিছু না। নুরুল দ্রুত মাথা নাড়তে থাকে, কিছু না। কিছু না।

আমি কথা বাড়ালাম না। ভিতরে ঢুকেই একটা অপরিচিত গন্ধ পেলাম। হালকা একটা গন্ধ, কিসের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে না, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত আসবাবপত্র থেকে যেরকম গন্ধ বের হয় অনেকটা সেরকম।

কয়েকবার নাক কুঁচকে নিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের গন্ধ এটা নুরুল?

গন্ধ? নুরুল চমকে ওঠে, গন্ধ পাচ্ছিস তুই?

হ্যাঁ।

নুরুলের মুখ আরও রক্তশূন্য হয়ে যায়। কোনোরকমে বলল, ও এলে কেমন একটা গন্ধ বের হয়।

আমি ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বললাম, আরে ধুর!

জুতা খুলে আমি বিছানায় ঢুকে পড়ি। নুরুল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি গায়ে চাদর টেনে নিয়ে বললাম, নুরুল শুয়ে পড়।

নুরুল ঠোঁট নেড়ে কী-একটা দোয়া পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিল, তারপর ঘরের এক কোনায় গিয়ে একবার হাততালি দিল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ওটা কী হল?

নুরুল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আয়াতুল কুরসি পড়ে হাততালি দিলে নাকি জিন-ভূত আসে না।

আমি বললাম, যে-ঘরে আমি আছি সেখানে এমনিতেই কোনোদিন জিন-ভূত আসবে না। ঘুমা।

www.MurchOna.com

চাদর গায়ে দিয়েও আমার ঠাণ্ডা লাগতে থাকে। এ-বছর এত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা পড়ে গেল!

আমি শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি। কেন জানি ঘুম আসতে চায় না। অস্বীকার করে লাভ নেই, নুরুলের কথাবার্তা শুনে কেমন জানি চাপা ভয় এসে ভর করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি এই ঘরটার মাঝে কোনো একটা সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, অসম্ভব ঠাণ্ডা এই ঘরটি, এই সময়ে এত ঠাণ্ডা হওয়ার কথা নয়। তার ওপর সারা ঘরে অস্বস্তিকর একটা গন্ধ। গন্ধটা আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে বাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ, তবু কেন জানি গা গুলিয়ে আসে।

আমি জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি। কে জানে হয়তো আমার জ্বর আসছে, তাই এরকম ঠাণ্ডা লাগছে। মানুষের জ্বর এলে ইন্দ্রিয় নাকি তীক্ষ্ণ হয়ে আসে, ছোটখাটো জিনিস বড় হয়ে ধরা পড়ে। চাদরটা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতে থাকি, যদিও মনে হচ্ছিল আজ রাতে ঘুম আর আসবে না।

কিন্তু ঘুম ঠিকই এসেছিল, তাই যখন হঠাৎ করে ঘুম ভাঙল, আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। সাধারণত ঘুম ভাঙার পর মানুষ আধো জাগা আধো ঘুমের মাঝে থাকে খানিকক্ষণ। আমি কিন্তু পুরোপুরি জেগে উঠলাম—মনে হতে থাকে ভয়ানক কোনো ব্যাপার হয়েছে এই ঘরে।

আমি চোখ খুলে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি। আধো অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট বোঝা যায় মশারির ভিতরে নুরুল সোজা হয়ে বসে আছে। যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য সেটা হচ্ছে মশারির বাইরে আরেকজন—চেহারা বা অবয়ব দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায় একটি মানুষ। অস্বস্তিকর মিষ্টি সেই গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া যায় না। ঘরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—তার মাঝে আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। শুনলাম, নুরুল কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, আমি যেতে চাই না—যেতে চাই না।

বাইরে দাঁড়ানো লোকটি নড়ে উঠল আর মনে হল যেন বাতাসে ভেসে উপরে উঠে গেল খানিকটা। আবার দুলে দুলে নেমে এল নিচে। তারপর খসখসে শুষ্ক একটা গলার স্বর শুনতে পেলাম, অনেক চিৎকার করে মানুষের গলা পুরোপুরি ভেঙে গেলে যেরকম একটা আওয়াজ বের হয় অনেকটা সেরকম। কথাগুলি বোঝা গেল না, মনে হল দুর্বোধ্য কিছু শব্দ। আমার পরিচিত কোনো ভাষা এটি নয়।

নুরুল কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারল সেই কথা। কারণ শুনলাম, অনুনয় করে বলল, না না না—আমি চাই না। চাই না।

শুষ্ক ধাতব সেই কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ল আর সাথে সাথে নুরুল প্রায় গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি আসছি।

www.MurchOna.com

দেখলাম মশারির ভিতর নুরুল নড়ে উঠল, তারপর হঠাৎ কাতর স্বরে কেঁদে উঠল।

প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার বোধশক্তি প্রায় পুরোপুরি লোপ পেয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে, মনে হতে থাকে নুরুল যদি মশারির ভিতর থেকে বের হয়ে আসে, ভয়ানক কিছু-একটা ঘটে যাবে, তাকে মেরে ফেলবে এই অশরীরী প্রাণী। কিন্তু নুরুলের নিজের উপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—আমি স্পষ্ট দেখছি গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মশারির ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে নুরুল।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে থাকি, কী হবে এখন? কী হবে? বুকের ভিতর হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে আমার। অশরীরী প্রাণী কি শুনতে পাচ্ছে আমার হৃৎস্পন্দন? আসবে কি এখন আমার কাছে? আমার ভিতর হঠাৎ কী হল জানি না, উঠে লাফিয়ে বসে হঠাৎ গলা ফাটিয়ে অমানুষিক স্বরে চিৎকার করে উঠলাম, না—নুরুল না—না।

সাথে সাথে প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়লাম বিছানার উপর। কিছু-একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিয়েছে। আমি চোখ খুললাম, বুকের উপর কিছু-একটা বসে আছে আমার, ছোটখাটো শিশুর মতো একটা প্রাণী। মুখের কাছে মুখ এনে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় প্রচণ্ড আক্রোশ সেই দৃষ্টিতে। মানুষের মতো কিন্তু ঠিক মানুষ নয়—

প্রচণ্ড চিৎকার করে আমি জ্ঞান হারালাম।

রাত দুটোর সময় টিপু আবার গিয়ে হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টকে ঘুম থেকে তুলেছিল।

আমার ধারণা সে-রাতে আমিই নুরুলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। নুরুলও সেটা বিশ্বাস করে, কিন্তু তবু সে আমাকে কোনোদিন ক্ষমা করেনি। কারণ সে-ঘটনার পর আমাদের দুজনকে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেজন্যে সে আমাকেই দায়ী মনে করে।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

নেকড়ে

জমাট আড্ডা হচ্ছিল বসার ঘরে। গোড়াতে বিষয়বস্তু ছিল রাজনীতি, কিছুক্ষণেই সেটা স্বাভাবিক গতিতে অসৎ ব্যক্তি এবং খুনখারাপিতে চলে এসেছে। খানিকক্ষণ সেটাতে স্থির থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু হঠাৎ মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কী হয় তাতে চলে এল। এটি একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু, দেখা গেল সবারই কিছু-না-কিছু বলার আছে। কাদের—যে ভাঙা জাহাজের ব্যাবসা করে প্রচুর পয়সা কামিয়েছে, বলল, মরে গেলে শেষ, আবার কী?

লুৎফুর ফিলসফিতে এম. এ. করেছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, শেষ কথাটির মানে কী? আপনার কাছে যেটা শেষ, আরেকজনের কাছে সেটা শুরু হতে পারে।

আরিফ কট্টর ইঞ্জিনিয়ার। সে বলল, শরীরটা হচ্ছে কম্পিউটারের মতো, মরে যাওয়া মানে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম ক্র্যাশ করে যাওয়া।

কম্পিউটার সবাই বোঝে না, তাই ব্যাপারটি ঠিক অনুভব করা গেল না। নজীবুল্লাহ্ এখনও প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজে যায়, সে গলা উঁচিয়ে বলল, মানুষের শরীর আর আত্মা এক জিনিস নয়, মরে যাওয়া মানে শরীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া, আত্মার ধ্বংস নেই। কোরান শরিফে আছে—

পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার কায়েস বাধা দিয়ে বলল, প্রমাণ করতে পারবেন? একটা আত্মাকে বোতলে ভরে এনে দিতে পারবেন? হাই ভোল্টেজ দিয়ে ডিসচার্জ করে স্পেক্ট্রামটা দেখতাম।

উত্তরে নজীবুল্লাহ্ কী-একটা বলতে যাচ্ছিল, সরকারি চাকুরে শওকত সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় মরে যাওয়াটা একটা ঘুমের মতো। ঘুমালে যেরকম কিছু আপনি জানেন না সেরকম—

নজীবুল্লাহ্ উচ্চস্বরে বলল, তার মানে আপনি বলতে চান পরকাল বলে কিছু নেই?

নাহ্।

সাথে সাথে ঘরে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। পরকাল আছে, পরকাল নেই এবং থাকলেই-বা কী আর না থাকলেই-বা কী—ঘরের সব মানুষ এই তিন দলে ভাগ হয়ে গেল। তিন দলের তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডায় ঘরে থাকা মুশকিল হয়ে যাবার অবস্থা।

ঘরের কোনার দিকে বসে ছিলেন কামাল সাহেব, নতুন এসেছেন, এখনও সবার সাথে ভালো করে পরিচয় হয়নি। ভদ্রলোক কথা কম বলেন তাই মনে হতে পারে যে অহংকারী, কিন্তু সেটা সত্যি নয়। আমি লক্ষ করলাম পরকাল নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হওয়ামাত্রই তিনি খুব তীক্ষ্ণ চোখে সবাইকে লক্ষ করতে শুরু করেছেন। কারও কারও কোনো কথা শুনে তাঁর মুখে সূক্ষ্ম হাসি খেলে যেতে থাকে, অবুঝ শিশুদের কথা শুনে বড়রা যেরকম হাসে, অনেকটা সেরকম। কট্টর পদার্থবিজ্ঞানী কায়েস যখন অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসল, তখন দেখলাম, তিনি কী-একটা কথা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন। শুধু চেপে গেলেন তা-ই নয়, মুখে একটা বিদ্রূপের হাসিকে সাবধানে গোপন করে শেলফ থেকে একটা বই নিয়ে ঘরের কোনায় সরে গেলেন।

আমার একটু কৌতূহল হল, তাই উত্তপ্ত আলোচনায় একটু ভাটা পড়তেই গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, কামাল সাহেব!

কী হল?

পরকাল নিয়ে আপনার কী ধারণা?

তিনি একটু হেসে বললেন, কখনো ভেবে দেখিনি। তবে—

তবে কী?

আমার মনে হয় অলৌকিক জিনিসপত্র সত্যি রয়েছে পৃথিবীতে।

বেশ কয়েকজন ঘুরে তাকাল তাঁর দিকে। আবিদ বলল, আপনার এরকম ভাবার কারণ কী? দেখেছেন নাকি কখনো কিছু?

কামাল সাহেব এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, দেখেছি।

দেখেছেন! এবারে সবাই ঘুরে তাকাল তাঁর দিকে।

কী দেখেছেন?

কামাল সাহেব একটু দ্বিধা করে বললেন, কী দেখেছি সেটা আমি নিজেও এখনও ঠিক জানি না। তবে—

তবে কী?

তবে আমি আমার জীবনে খুব একটা অস্বাভাবিক জিনিস দেখেছি।

বলুন দেখি—শুনি কী দেখেছেন।

অনেক লম্বা গল্প সেটি, গুছিয়ে বলা মুশকিল। সত্যি শুনতে চান?

হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনি।

সবাই এবারে একটু এগিয়ে আসে।

www.MurchOna.com

কামাল সাহেব মাথা চুলকে বললেন, আমি আবার গুছিয়ে বলতে পারি না, আগেরটা পরে, পরেরটা আগে বলে ফেলি, কিছু বলতে গেলে যেটা বলার দরকার নেই সেটা বলে সময় নষ্ট করতে থাকি।

কিছু ক্ষতি নেই, আমি সাহস দিয়ে বলি, গল্প যদি ভালো হয়, কীভাবে বলা হল তাতে কিছু আসে-যায় না।

তা ঠিক, তবে মুশকিল হল গল্পটা ভালো কি না সেটাও আমি জানি না। শুনুন তা হলে—

আমি তখন নূতন আমেরিকায় গেছি। সেদেশের হালচাল ভালো জানি না। নেহাতই গোবেচারা ছাত্র, পড়াশোনা করতে করতে দম ফেলার অবসর নেই। কনডেন্স কোর্সে পরীক্ষা পাশ করে গেছি, আমেরিকাতে এসে একেবারে অতল পানিতে ডুবে যাবার অবস্থা।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কয়েকজন বাঙালি ছেলে ছিল, তার মাঝে একজন মহা চালবাজ, তার নাম ফরিদ। আমি নতুন এসেছি, তাই তখনও টের পাইনি। সে আমাকে মাঝে মাঝে নানারকম জ্ঞানবুদ্ধি দেয়। গোবেচারা বাঙালি আমি, সে যেটাই বলে আমি সরলমনে বিশ্বাস করি। অনেক গল্প আছে তার, কিন্তু এখন সেটা থাক।

সেই ফরিদ একদিন আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, এই শনি-রবিবারে কী করছ কামাল?

আমি বললাম, হোমওয়ার্ক আছে দুটা, শেষ করতে হবে। বাসায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল চিঠি লেখা হয়নি, মা হয়তো দুশ্চিন্তা করছেন।

এইজন্যে বাঙালির উন্নতি হয় না, ফরিদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এত বড় হয়েছ এখনও মায়ের আঁচল ধরে ঘোরাঘুরি? জান, আমি ছয়মাস দেশে কোনো চিঠি লিখিনি!

আপনার মা চিন্তা করেন না?

করলে করবে, আমার কী? আমেরিকানরা কী করে জান? বয়স ষোলো হতেই ঘর থেকে গেট আউট। এই জাতির উন্নতি হবে না তো কার হবে?

বাসা থেকে গেট আউটের সাথে জাতির উন্নতির সম্পর্কটা চট করে ধরা মুশকিল, আমি সে-চেষ্টা না করে বললাম, কিন্তু হোমওয়ার্ক দুটা?

আরে ধুত্তুরি তোমার হোমওয়ার্ক! ফরিদ ধমক দিয়ে বলল, একটা দুটা হোমওয়ার্ক দেরি করে দিলে কিছু হয় না। চলো এই শনি-রবিবারে ক্যাম্পিং করে আসি।

আমেরিকা এসে কোথাও বের হইনি, পড়াশোনার চাপে একেবারে শেষ হয়ে যাবার অবস্থা। ফরিদের কথা শুনে কেমন জানি নরম হয়ে গেলাম, দুদিনের জন্যে সবকিছু ছেড়েছুড়ে ক্যাম্পিং করতে যাব, ভেবেই কেমন জানি জিবে পানি এসে গেল।

ফরিদ আমাকে কী কী নিতে হবে তার একটা লম্বা লিস্ট দিয়ে গেল। সেখানে নেই এমন জিনিস নেই, আমি কষ্ট তবু করে অনেক লোকজনকে ধরাধরি করে জিনিসপত্র জোগাড় করে শুক্রবার রাতে সকাল-সকাল শুতে গেলাম। শনিবার খুব ভোরে আমাকে ফরিদের এসে তুলে নেবার কথা, কিন্তু আমাকে ঘুম থেকে তুলল মুশকো জোয়ান এক আমেরিকান ছেলে। এদেশের লোকের কথা তখনও ভালো বুঝতে পারি না, ভাসাভাসাভাবে বুঝলাম ফরিদ তাকে পাঠিয়েছে আমাকে তুলে নেবার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম শুধু ফরিদ আর আমিই যাব, বিদেশি লোকজন থাকলে আমি কি আর যাই? যাই হোক, তখন কিছু করার নেই, আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বের হলাম। ঢাউস একটা গাড়ি হাঁকিয়ে সে সাথে সাথে রওনা দিয়ে দিল। ফরিদকে তার বাসা থেকে না তুলেই যখন সে হাইওয়েতে উঠে গেল, আমি একটু অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ফরিদকে তুলবে না?

সে আরও অবাক হয়ে বলল, ফরিদ? সেটা কে?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে বললাম, আমি যে যাব তুমি কেমন করে জানলে?

ছেলেটি কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বলল, আমি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পিংয়ের দায়িত্বে আছি, লোকজনকে খোঁজখবর দিই। গত সপ্তাহে একজন ফোন করে বলল, তুমি নাকি খুব ক্যাম্পিং-এ যেতে চাও, তোমাকে যেন কেউ-একজন নিয়ে যায়। এ-সপ্তাহে আমি যাচ্ছিলাম, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমার তখনও বিশ্বাস হয় না, চিঁচিঁ করে বললাম, ফরিদকে তুমি চেনই না?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, নাহ্। কখনো নামও শুনিনি।

আমি চোখে আঁধার দেখলাম। পড়াশোনা ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত মুশকো একজন আমেরিকানের সাথে দুদিনের জন্যে গভীর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো রসিকতা যে ফরিদ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না সেটা আমি তখনও জানি না। এখানকার খবরের কাগজে কতরকম খুনখারাপির কথা পড়ি, এই লোক যদি আমাকে খুন করে জঙ্গলে পুঁতে ফেলে, কেউ তা জানতেও পারবে না!

ছেলেটি কিছু-একটা আঁচ করতে পারল, বলল, তুমি যদি তোমার বন্ধুকে ছাড়া একা একা যেতে না চাও আমাকে বলো, তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিই। আমি প্রায়ই যাই ক্যাম্পিং করতে, পরেরবার তোমার বন্ধুকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যাবে।

ছেলেটির সহৃদয় কথাটি আমায় একটু সাহস দিল, বললাম, না না, চলো যাই। আমি আগে কখনো ক্যাম্পিং-এ যাইনি, তাই আমাকে নিয়ে তোমার খুব সমস্যা হবে।

ছেলেটি একগাল হেসে বলল, কাউকে নিয়েই সমস্যা হয় না, জঙ্গলে তো আর নিয়মকানুন নেই যে তুমি ভুল করবে! তুমি ঘাবড়িও না, দেখবে খুব মজা হবে।

www.MurchOna.com

আমি তখন প্রথমবার নিজেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতে থাকি যে সত্যি খুব মজা হবে।

একটু পর সত্যি সত্যি আমার মজা লাগতে থাকে। আগে কখনো ঘর থেকে বের হইনি, যেটাই দেখি মুগ্ধ হয়ে যাই। এই এলাকাটা ভারি সুন্দর, একই সাথে পাহাড় আর হ্রদ, তার মাঝে সবুজ ঘন অরণ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছেলেটি, যার নাম জন ল্যামিং, একটু ভাবুক ধরনের ছেলে, খুব-একটা কথা বলে না, কিন্তু খুব সহৃদয় ধরনের মানুষ। বুঝতে পেরেছে যে আমি এদেশে একেবারেই নতুন, কিছুই জানি না। সে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে সবকিছু বলে দিতে থাকে। দুপুরে যখন ম্যাকডোনাল্ড নামে হ্যামবার্গার খাবার জায়গায় থামলাম, সেখানেও সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে এটার নাম হ্যামবার্গার হলেও জিনিসটা গোরুর মাংস দিয়ে তৈরি। শুধু তা-ই নয়, আমেরিকানদের সব রীতিনীতি ভঙ্গ করে সে আমার খাবারের পয়সা দিয়ে দিল, কিছুতেই আমাকে দিতে দিল না। আমার তখন ছেলেটিকে ভালো লাগতে শুরু করেছে এবং প্রথমবার ফরিদ যে সাথে নেই সেজন্যে খুশি হয়ে উঠতে থাকি।

প্রায় সারাদিন গাড়ি চালিয়ে বিকেল তিনটার দিকে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছালাম। পাহাড়ের গা-ঘেঁষে ছবির মতন একটা জায়গা। নাম ওলিম্যাওয়া, রেড ইন্ডিয়ানদের দেওয়া নাম। জন তার গাড়ি এক জায়গায় পার্ক করে গাড়ি থেকে নামল। সেখানে আরও কয়েকটা গাড়ি পার্ক করে রাখা আছে। অন্যান্য যারা এসেছে তারাও এখানে গাড়ি রেখে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। জনের সাথে হাত লাগিয়ে জিনিসপত্র বের করা হল, তার একটা ঢাউস ব্যাকপেকে জিনিসপত্র ভরে রাখা আছে। আমি এ-ব্যাপারে নতুন, জিনিসপত্রের প্রায় বেসামাল অবস্থা। জন একটু ঠিকঠাক করে দিল, তারপর সময় নষ্ট না করে প্রায় সাথে সাথেই আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। জনের কাছে ছোট একটা বই আছে, তাতে নাকি লেখা হাজার দুয়েক ফুট উঠে গেলে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে একটা হ্রদ পাওয়া যাবে। ভারি চমৎকার একটা জায়গা, সেখানেই তাঁবু খাটানোর ইচ্ছা।

আমি খুব শক্ত মানুষ নই, তবে ছেলেবেলায় কাদায় গড়াগড়ি করে খুব ফুটবল খেলেছি। সে-কারণেই কি না জানি না বেশ খাটার ক্ষমতা আছে। প্রকাণ্ড ব্যাকপেক-বোঝাই জিনিস ঘাড়ে নিয়ে জনের পিছুপিছু পাহাড়ে উঠতে শুরু করি। ঘাড়ে বোঝা নিয়ে যাওয়া এক কথা, কিন্তু বোঝা নিয়ে পাহাড়ে ওঠা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। যারা কোনোদিন সেটা করেনি, তারা বুঝতে পারবে না ব্যাপারটি কী অমানুষিক। জন আমার জন্যে আস্তে আস্তে হাঁটছিল, কিন্তু যত ঘনঘন থামা উচিত তত ঘনঘন থামছিল না। আমার ঘাড়ে তখন দেশের ইজ্জত—তাকে একটু পরপর বলতেও পারি না যে আর পারি না, একটু থামো!

www.MurchOna.com

দুই হাজার ফুট উপরে উঠতে আমার যে-পরিমাণ পরিশ্রম হল সারা জীবনে আমার কখনো তত পরিশ্রম হয়নি। শেষ পর্যন্ত যখন সেই হ্রদের তীরে এসে হাজির হলাম, মনে হল এখন হয়তো মরেই যাব। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমার তাকানোর শক্তি হল, দেখলাম হ্রদটা সত্যি চমৎকার, পাহাড়ের এত উপরে যে হ্রদ থাকতে পারে ধারণাই ছিল না। চারদিক পাইনগাছে ঢাকা। গাঢ় নীল রঙের পানি ঝকঝক করছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোতে কেমন যেন একটা অশরীরী ভাব। হ্রদের তীরে ইতস্তত আরও কয়েকটা তাঁবু। জন এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, চলো, আরও একটু উপরে যাই।

আমি আঁতকে উঠে বললাম, আরও উপরে? কেন?

দেখছ না মানুষের ভিড় এখানে! উপরে নিরিবিলি হবে।

আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না যে ইতস্তত কয়েকটা তাঁবু দেখে জনের কাছে মনে হচ্ছে এখানে অনেক ভিড়। ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবার আগেই দেখি সে তার ঢাউস ব্যাকপেক ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। আমি কী আর করি, আমার ব্যাকপেক ঘাড়ে নিয়ে পিছুপিছু রওনা দিলাম।

আরও শখানেক ফুট উপরে উঠে জন একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে বের করল। জায়গাটা দেখে আমি অবশ্যি এই গোঁয়ারগোবিন্দ নির্জনতাপ্রিয় মানুষটিকে মাপ করে দিলাম। একটু উপর থেকে দৃশ্যটিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, দূরে দেখা যাচ্ছে পর্বতশ্রেণী। নীল, হালকা নীল হয়ে সেগুলি মিশে গিয়েছে দূরে। দেখে মনে হল জন্ম বুঝি এতদিন পরে সার্থক হল।

জনকে দেখেই বোঝা যায় সে পাহাড়ে-পাহাড়েই ঘোরাঘুরি করে সময় কাটায়। ব্যাকপেক থেকে তাঁবুটা বের করে চোখের পলকে দাঁড় করিয়ে ফেলল, গোল গম্বুজের মতো তাঁবু—সামনে ছোট দরজা, হাঁটু গেড়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। ভিতরে আমাদের স্লিপিং ব্যাগ দুটি পেতে দেওয়া হল। দেখে ভিতরে বেশ একটা আরামদায়ক আস্তানার মতো মনে হতে থাকে। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই শুয়ে পড়ি, কিন্তু শোয়া গেল না। বাইরে জন খুটখাট শব্দ করে কী যেন করছে। বের হয়ে দেখি সে ছোট একটা গ্যাসোলিনের চুলায় রান্না চাপিয়েছে। রান্না অবশ্যি সত্যিকার অর্থে রান্না নয়, বাটিতে পানি গরম করছে, সাথে স্যুপের প্যাকেট আছে। ফুটন্ত পানিতে প্যাকেট খুলে ছেড়ে দিলেই নাকি গরম স্যুপ হয়ে যাবে। আমি নতুন এসেছি, এখানকার খাবারদাবারে এখনও অভ্যস্ত হতে পারিনি, কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর ঠাণ্ডায় এই গরম স্যুপের কথা চিন্তা করেই জিবে পানি এসে গেল। আমি সাথে কিছু ফলমূল আর শুকনো খাবার এনেছি, সেগুলিও গরম করে ফেলার ব্যবস্থা করা হল।

হ্রদের কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে আমরা আরাম করে বসি। চারদিকে এর মাঝে সুমসাম অন্ধকার, তার মাঝে হিসহিস করে গ্যাসোলিনের চুলা জ্বলছে। নীলাভ আলো অন্ধকার দূর করতে পারছে না, বরং কেমন যেন আধিভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছে।

www.MurchOna.com

জনের সাথে আজই আমার প্রথম দেখা, কিন্তু সারাদিন একসাথে কাটিয়ে এখন রাতের বেলা এই নিরিবিলিতে তাকে বেশ কেমন যেন আপনজনের মতো মনে হতে থাকে। দুজনের জন্ম হয়েছে দুই দেশে, বড় হয়েছি দুই পরিবেশে, ভাষা দুই রকম—সবকিছুই কেমন জানি হঠাৎ গুরুত্বহীন হয়ে যায়। মনে হতে থাকে দুজন দুজনকে দীর্ঘদিন থেকে চিনি। আস্তে আস্তে কথায়-কথায় নিজেদের পরিবার, ভাই-বোন, বাবা-মায়ের কথা চলে আসতে থাকে।

খাওয়ার পর জন দুই মগ কফি তৈরি করল। আমি তখনও কফি খাওয়া শিখিনি। প্রচুর দুধ এবং চিনি মিশিয়ে পায়েসের মতো করে দিলে খেতে পারি। এখানে দুধ এবং চিনি কিছুই নেই। তবু জনকে খুশি করার জন্যে সেই বিস্বাদ তেতো পোড়া গন্ধের কফি খাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল, অন্তত আমি তা-ই ভেবেছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মোটে সাড়ে আটটা। বনজঙ্গলে সবসময় এরকম হয়, কিন্তু কিছু করার থাকে না বলে ঘড়ি চলতে চায় না। জন কিন্তু ঘড়ি দেখে চমকে উঠল, বলল, সর্বনাশ, সাড়ে আটটা বেজে গেছে! চলো শুয়ে পড়ি।

এখনই?

হ্যাঁ। রাতে তো কিছু করার নেই, কিন্তু সকালে উঠতে পারলে লাভ আছে। মনে কোরো না যে তুমি খুব আরামে ঘুমাবে, একটু পরপর ঘুম ভাঙবে সারারাত। ছাড়াছাড়াভাবে ঘুমাবে তুমি। ঘুম যদি নাও হয় বিশ্রাম হবে, সেটাই দরকার।

আমরা উঠতে যাব হঠাৎ করে যেন জাদুমন্ত্রের মতো চারদিক আলো হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে বললাম, কিসের আলো?

চাঁদ।

পাহাড় এতক্ষণ চাঁদকে আড়াল করে রেখেছিল বলে দেখতে পাইনি, এখন হঠাৎ করে বের হয়ে চারদিক আলো করে দিয়েছে। প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখে আমি কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারি না। দূরে পাহাড়ের সারি, পাইনগাছ, পাথরের উপর দিয়ে একটা ছোট ঝরনা বয়ে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে একেবারে অলৌকিক একটা দৃশ্য।

জন আস্তে আস্তে বলল, আমার মনে ছিল না, আজ পূর্ণিমা।

আমি বললাম, শহরে কি আর কেউ অমাবস্যা-পূর্ণিমার কথা খেয়াল রাখে!

আমি রাখি। আমি পূর্ণিমার রাতে কখনো ঘর থেকে বের হই না। যদি জানতাম পূর্ণিমা, আজ আসতাম না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

আছে একটা ব্যাপার। জন গম্ভীর হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছাপ পড়ে গেছে। আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। জন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অলৌকিক জিনিস বিশ্বাস কর?

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

আমি? না।

তোমাদের দেশে তো অনেকরকম রহস্যময় ব্যাপার আছে। তবু বিশ্বাস কর না?

না। আমাদের দেশে কোনো রহস্যময় ব্যাপার নেই। অনেক কুসংস্কার আছে, কিন্তু কোনো রহস্যময় ব্যাপার নেই।

তুমি 'ওয়ার উলফ'-এর কথা শুনেছ?

আমি একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ শুনেছি। পূর্ণিমার রাতে কোনো কোনো মানুষ নেকড়ে বাঘ হয়ে যায়।

হ্যাঁ। মানুষ কীভাবে 'ওয়ার উলফ' হয়, জান?

না।

একটা ওয়ার উলফ যদি অন্য একজন মানুষকে কামড়ায় তা হলে সেই মানুষটি ওয়ার উলফ হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার তো! আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, আছে নাকি তোমার পরিচিত কোনো ওয়ার উলফ?

জন উত্তর না দিয়ে আবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, কী ব্যাপার জন? তুমি মনে হচ্ছে একটু চিন্তিত?

নাহ্, চিন্তা করে আর কী হবে? একটু থেমে বলল, তোমাকে বলি তা হলে ব্যাপারটা। বছর দুয়েক আগে একবার আমি ক্যাম্পিং করতে গিয়েছিলাম। একটা ছোট পেট্রল পাম্পে পেট্রল নিচ্ছি, তখন সেখানকার লোকটা বলল, এই এলাকায় নাকি একটা ওয়ার উলফ আছে। পূর্ণিমার রাতে বের হয়, সারারাত ডাকাডাকি করে। রেঞ্জার, ফরেস্ট অফিসার অনেকরকম চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি।

আমি ব্যাপারটাতে কোনো গুরুত্ব দিইনি। একটা নদীর ধারে ক্যাম্প করে রাত কাটাতে গিয়েছি। সেদিনও পূর্ণিমার রাত। গভীর রাতে শুনি কে যেন আমার তাঁবুর উপর নখ দিয়ে শব্দ করছে। আমি টর্চলাইট জ্বালিয়ে ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি একটা ভালুক। ভালুক আমি আগে অনেক দেখেছি, মানুষকে সাধারণত ঘাঁটায় না, আমি ভাবলাম এবারেও তা-ই হবে। কিন্তু ভালুকটা সরে না গিয়ে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগল। আমি ভয় দেখানোর জন্যে যেই টর্চলাইটটা হাতে নিয়ে হাত নেড়েছি, সেটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁবুর উপর দিয়েই হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল। আমি চিৎকার করে টর্চলাইট দিয়ে ওটার মাথায় মারতে লাগলাম, তখন হঠাৎ করে আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল।

হাত থেকে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু আমি কিছু করতে পারছিলাম না। বের হয়ে সাহায্যের জন্যে যাব তার উপায় নেই, ভালুকটা সারারাত আশেপাশে নাকিসুরে কাঁদার মতো শব্দ করছিল। আমি কোনোমতে ফার্স্ট এইডের জিনিস দিয়ে হাত বেঁধে রক্ত বন্ধ করে বসে রইলাম। ভোররাতের দিকে হঠাৎ করে ভালুকটার

সাড়াশব্দ বন্ধ হয়ে গেল, তখন বের হয়ে এসে কোনোমতে রাস্তার পাশে হাজির হলাম। খুব বাঁচা বেঁচে গেছি সেবার।

আমি প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, সেই ভালুকটার কী হল?

কিছু হয়নি। কেউ ধরতে পারেনি। অনেকদিন নাকি পূর্ণিমার রাতে ফিরে আসত, কিন্তু সে পর্যন্তই। অনেকে বলে সেটাই ওয়ার উলফ—

কিন্তু তুমি তো বললে ভালুক। ভালুক ওয়ার উলফ হবে কেমন করে? উলফ মানে তো নেকড়ে—

তা আমি জানি না। যে-কোনো প্রাণীই নাকি ওয়ার উলফ হতে পারে। অনেকে বলেছে, সেটা আমাকে কামড়েছে, তাই আমি নাকি হঠাৎ করে কোনো রাতে ওয়ার উলফ হয়ে যাব।

আমি শব্দ করে হাসতে গিয়ে থেমে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সত্যি সেটা বিশ্বাস কর?

আগে করতাম না। কিন্তু এক পূর্ণিমার রাতে বাসায় ফিরছি। ইউনিভার্সিটির মোড়ে যেই গাড়ি ঘুরিয়েছি দেখি আকাশে মস্ত পূর্ণিমার চাঁদ। দেখামাত্র আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

সত্যি?

হ্যাঁ। তারপর হঠাৎ আমার শরীর কাঁপতে শুরু করে। মনে হতে থাকে নখগুলি লম্বা হয়ে যাচ্ছে, দাঁতগুলি বের হয়ে যাচ্ছে—আর সারা শরীর গরমে ঘেমে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে কোনোমতে গাড়ি চালিয়ে বাসায় এসেছি, দৌড়ে বাসায় ঢুকে বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম।

কী দেখলে?

দেখলাম, কিছু না। আমি ঠিকই আছি।

তোমার মনের ভুল।

হতে পারে। জন একটা ছোট নিশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার কিন্তু জীবনে আর কখনো মনের ভুল হয়নি। সেই থেকে আমি সব পূর্ণিমার রাতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাবে গিয়ে বিয়ার খেয়ে আধা-মাতাল হয়ে যাই। বনেজঙ্গলে আর যাই না।

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, জন, আমি যদি নিজের চোখেও দেখি যে তুমি আস্তে আস্তে ভালুক নাহয় নেকড়ে হয়ে যাচ্ছ, আমি বিশ্বাস করব না। কিছু-কিছু জিনিস হতে পারে না।

ঠিকই বলেছ। জন চুপ করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুজনে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে পড়ি। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, আমার পরনে অন্তত তিনপ্রস্থ কাপড়, মাথায় মাংকি ক্যাপ। স্লিপিং ব্যাগটাও হাঁসের

www.MurchOna.com

পালক দিয়ে তৈরি, এখানে বলে ডাউনের। এই ডাউনের স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে নাকি বরফের উপর ঘুমানো যায়। আমার অবশ্যি সেরকম মনে হল না, ভিতরে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি। মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে নিশ্বাস ফেলে ফেলে ভিতরে একটু গরম করে নিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। জন একেবারে চুপচাপ শুয়ে আছে। পূর্ণিমার চাঁদটা দেখে এরকম করে ঘাবড়ে যাবে কে জানত! এদেশেও এত লেখাপড়া জানা লোকজনের ভিতরে এতরকম কুসংস্কার আছে! আমি শুয়ে শুয়ে পাহাড়ের, নদীর, জঙ্গলের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। জনের কথা সত্যি, ঘুমটা হল ছাড়া-ছাড়া, একটু পরপর আমার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল।

মাঝরাতে হঠাৎ কী-একটা শব্দে আবার আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। হঠাৎ করে আমার সবকিছু মনে পড়ে। কিছু-একটা বিচিত্র শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছে। আমি বোঝার চেষ্টা করতে থাকি শব্দটা কোথা থেকে এসেছে। কান পেতে শুনলাম, জন কেমন জানি একধরনের শব্দ করছে। অনেক কেঁপে জ্বর উঠলে মানুষ যেরকম শব্দ করে, সেরকম। আমি মাথা বের করে ডাকলাম, জন!

জন কোনো উত্তর দিল না। আমি ভয়ে ভয়ে গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, জন। কী হয়েছে জন?

জন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ গোঙানোর মতো শব্দ করতে থাকে। আমি তার ভারী নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই।

মাথার কাছে টর্চলাইট ছিল। হাতড়ে হাতড়ে সেটা বের করে জ্বালালাম। জন স্লিপিং ব্যাগের ভিতর পুরোপুরি মাথা ঢেকে শুয়ে আছে বলে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি আবার কাঁপা গলায় ডাকলাম, জন—

হঠাৎ করে জন মাথার উপর থেকে স্লিপিং ব্যাগ সরিয়ে নিল, তাকে দেখে আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠি। বীভৎস একটি মুখ—জনের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। সারা মুখ কালো চুলে ঢেকে গেছে, উঁচু কপাল, লম্বা মুখমণ্ডল। বিস্তৃত মুখ থেকে ধারালো দাঁত বের হয়ে আছে। মুখের দুপাশ থেকে হলুদ রঙের তরল গড়িয়ে পড়ছে। সারা তাঁবু দূষিত দুর্গন্ধে ভরে গেল হঠাৎ।

সেই বীভৎস প্রাণীটি—যেটি নিশ্চয় জন, আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ শিউরে উঠে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কোনোভাবে উবু হয়ে বসার চেষ্টা করতে থাকে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি। সত্যিই কি সে আমার চোখের সামনে ভালুক হয়ে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব! কিন্তু আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কেমন করে?

জন হঠাৎ ভয়ংকরভাবে কেঁপে ওঠে, আর আমি অবাক হয়ে দেখি তার মুখটা আরও ইঞ্চিখানেক লম্বা হয়ে গেছে। সে প্রাণপণে তার ঘাড় ঝাঁকাতে থাকে, শরীর বাঁকা করে নাড়তে থাকে। শরীরের ভিতর থেকে হঠাৎ কেমন জানি মটমট শব্দ বের হয়ে আসে, কেউ যেন ভিতরে তার হাড়গোড় চূর্ণ করে দিচ্ছে।

www.MurchOna.com

আমি অবাক হয়ে দেখি তার শরীরটা আশ্চর্যরকমভাবে বিকৃত হয়ে একটা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো হয়ে যাচ্ছে।

আমি আতঙ্কে পাথর হয়ে বসে থাকি। কী করব বুঝতে না পেরে শুকনো গলায় আবার ডাকলাম, জন—

প্রাণীটি আমার দিকে তাকাল। আশ্চর্য এক জোড়া নীল চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে। থরথর করে খানিকক্ষণ কেঁপে আবার আমার দিকে তাকাল, মুখটা আরও লম্বা হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর কালো লোমে ঢেকে যাচ্ছে, মুখের কষ বেয়ে লালা ঝরছে। হঠাৎ করে প্রাণীটি মুখ হাঁ করে, দুপাটি ধারালো দাঁত টর্চের আলোতে চকচক করে উঠল।

আমার ভিতর হঠাৎ জান্তব একটা ভয় এসে ভর করল। এখান থেকে আমাকে পালাতে হবে, এই প্রাণীটির হাতে প্রাণ খোয়ানোর আগে পালাতে হবে। আমি সাবধানে পিছনে সরে আসতে চেষ্টা করলাম। তাঁবু থেকে বের হওয়ার জন্যে ছোট দরজা মাথার কাছে, চেন দিয়ে আটকানো। আমি সাবধানে খোলার চেষ্টা করলাম—জন্তুটা হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাল। দাঁত বের করে গর্জন করল একবার চাপাস্বরে। আমি আতঙ্কে তখন জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়েছি। হাতের টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে জন্তুটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলাম। হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই জন্তুটা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি চিৎকার করে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলাম। জন্তুটা আমার বাম হাত কামড়ে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁকাচ্ছে। মনে হচ্ছে হাতটা আমার শরীর থেকে টেনে ছিঁড়ে নিতে চায়। যন্ত্রণা নয়, প্রচণ্ড ভয়ে আমি হাতের টর্চলাইটটা দিয়ে প্রাণপণে সেটার মাথায় আঘাত করতে থাকি।

এরকম পরিবেশে মানুষ সচরাচর পড়ে না। আর এরকম পরিবেশে না পড়া পর্যন্ত মানুষ বলতে পারে না সে তখন কী করবে। আমার মনে নেই আমি কী করেছিলাম, বেঁচে থাকার আদিমতম প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই কাজ করছিল, কারণ অন্ধকারে হুটোপুটি করতে করতে হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, আমি তাঁবুর বাইরে। কীভাবে সেটা সম্ভব হয়েছিল এখনও আমি জানি না।

তাঁবু থেকে বের হয়ে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আমার তখন সেটা খেয়াল নেই। ঠাণ্ডার জন্যে পায়ে মোজা পরে শুয়েছিলাম, তবুও পাথরের আঘাতে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আমি অন্ধকারে চিৎকার করতে করতে নিচে ছুটে এলাম—সেখানে বেশ কয়েকটা তাঁবু, বিকেলে আমি আর জন তাদের পার করে উপরে উঠে গিয়েছি।

আমার চিৎকারে তাঁবু থেকে সবাই বের হয়ে এল। জ্ঞান হারানোর আগে আমি কিছু বলেছিলাম কি না মনে নেই। বলে থাকলেও নিশ্চয়ই বাংলাতেই বলেছি—ওরকম অবস্থায় মানুষ ইংরেজিতে কথা বলবে কেমন করে?

www.MurchOna.com

কামাল সাহেব এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিলাম, নিশ্বাস আটকে রেখে বললাম, তারপর?

দেখতেই পাচ্ছেন জানে বেঁচে গেলাম। আমাকে দেখেই সবাই বুঝতে পেরেছে ভালুক বা অন্য কোনো প্রাণী আক্রমণ করেছে। নিচে খবর পাঠানো হল, রেঞ্জার ছুটে এল উপরে, স্ট্রেচারে করে নামানো হল আমাকে নিচে—আমি অবশ্যি এসব কিছু জানি না।

আর জনের কী হল?

কামাল সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, সেটা আরেক কাহিনী। পুলিশ আর রেঞ্জার আমাদের তাঁবুতে গিয়ে দেখে পুরো তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, জনের চিহ্নমাত্র নেই। সবাই আশঙ্কা করল ভালুকের হাতে জনের কিছু-একটা হয়েছে—অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল জনের, সে-রাতে তাকে পাওয়া গেল না। সে ফিরে এল পরদিন ভোরে—বিধ্বস্ত চেহারা, রাতে কী হয়েছে কিছুই মনে করতে পারে না। সবাই অবাক হয়েছিল দেখে যে একই তাঁবুতে থেকে আমার প্রাণ যাবার অবস্থা হয়েছিল ভালুকের আক্রমণে, কিন্তু তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি।

হাসপাতালে আমার সাথে একদিন দেখা করতে এসেছিল জন। যখন আশেপাশে কেউ ছিল না, তখন আমার কাছে এসে বলল, আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে তুমি?

কী সত্যি কথা?

সে-রাতে কি আমি তোমাকে আক্রমণ করেছিলাম?

হাসপাতালের ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে আছি, মাথার কাছে মনিটরে আমার হৃৎস্পন্দন রক্তচাপ মাপা হচ্ছে, সামনে টেলিভিশন স্ক্রীনে একটা হাসির অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমার বাম হাতে একটা সুইচ, টিপলেই একজন নার্স ছুটে আসবে। এরকম অবস্থায় আমার নিজেরই বিশ্বাস করা শক্ত যে জন ভালুক হয়ে আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, তুমি আক্রমণ করনি, একটা ভালুক আক্রমণ করেছিল।

আমি দেখলাম জনের বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। আস্তে আস্তে বলল, তুমি যে আমাকে কী শান্তি দিলে বোঝাতে পারব না। আমি সত্যি বিশ্বাস করা শুরু করেছিলাম যে আমি একটা ওয়্যার উলফ!

জন খানিকক্ষণ গল্প করে চলে যাচ্ছিল। আমি যাবার আগে বললাম, তুমি আমাকে একটা কথা দাও।

কী?

পূর্ণিমার রাতে তুমি আর কখনো ক্যাম্পিং-এ যাবে না।

www.MurchOna.com

সাথে সাথে জনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, একথা বলছ কেন?

আমি সহজ গলায় বললাম, দেখা গেছে পূর্ণিমার রাতে অনেক জন্তু-জানোয়ার খেপে যায়—পূর্ণচন্দ্রের একটা প্রভাব থাকতে পারে। কে জানে হয়তো তোমার উপরে আবার আক্রমণ হবে—আমার উপর যেরকম হয়েছিল! দরকার কী?

জন খানিকক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ঠিক আছে।

এরপর জনের সাথে আমার আর দেখা হয়নি। শুনেছি এই ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে গেছে।

কামাল সাহেব থামলেন। আমরা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। কট্টর ইঞ্জিনিয়ার আরিফ একটু কেশে বলল, আপনি বলেছেন ভালুকটা আপনাকে কামড়েছিল। সেটা সত্যিই যদি ওয়ার উলফ হয়ে থাকে তা হলে আপনিও ওয়ার উলফ। পূর্ণিমার রাতে আপনি কি কখনো ভালুক হয়েছেন? জানেন তো আজ পূর্ণিমা?

ভেবেছিলাম কামাল সাহেব হেসে উঠবেন। তিনি হাসলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, আমি জানি না।

ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ করে কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠল।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

সুতোরন্তু

ছেলেবেলা থেকেই আনিস একটু পাগলা গোছের। সে প্রথমবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বারো বছর বয়সে। নিজেই ফিরে এসেছিল সপ্তাহখানেক পরে। চাচার বাড়িতে মানুষ, চাচা-চাচি মিলে তখন গোরুর মতো পেটাল তাকে। আমরা ভাবলাম শিক্ষা হয়েছে, আর পালাবে না। কোথায় কী! ছয়মাসের মাথায় আবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, ফিরে এলে আবার চাচা-চাচি মিলে পালা করে পেটাল তাকে।

মার খেয়ে আনিস বিশেষ কান্নাকাটি করত না। শরীরটা নরম করে রাখলে নাকি মার খেলে ব্যথা লাগে না। তা ছাড়া সে নাকি এক পাগলা ফকিরের কাছ থেকে 'কুফুরি কালাম' শিখে এসেছে। দুচোখ বন্ধ করে একবার সেই কুফুরি কালাম পড়ে নিলে সব যন্ত্রণা নাকি বাতাসের মতো উবে যায়। দশ টাকা দিলে আমাকে সব শিখিয়ে দেবে বলেছিল। ছেলেবেলায় পুরো দশ টাকা একসাথে কখনো জোগাড় করতে পারিনি বলে সেই অমূল্য মন্ত্র আমার আর শেখা হয়নি।

আনিস বাড়ি থেকে পালিয়ে বিচিত্র সব জায়গায় যেত। কোন ভাঙা মন্দিরে নাঙ্গা সন্ন্যাসী থাকে, কোন পুকুরে জ্যোৎস্নারাতে পরী নেমে আসে, কোন শ্মশানে পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক থাকে এইসব খোঁজখবর তার নখদর্পণে ছিল। কারও সাথে কথাবার্তা বেশি বলত না। আমার মনটা একটু নরম ছিল বলে চাচা-চাচি মিলে তাকে পিটিয়ে যখন আধমরা করে রাখত, আমি একটু সেবা-শুশ্রূষা করতাম, সেজন্যে আমাকে মাঝে মাঝে সে একটা-দুটো মনের কথা বলত।

সেই আনিসের সাথে আমার দেখা হল প্রায় কুড়ি বছর পরে। কমলাপুর স্টেশনে চশমা-পরা একজন মানুষ আমার কাছে এসে বলল, ইকবাল না?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি?

আমি আনিস। মনে আছে চাচা মেরে একদিন রক্ত বের করে দিল, তুই দূর্বা চিবিয়ে লাগিয়ে দিলি? ইনফেকশান হয়ে গেল তখন—

www.MurchOna.com

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, পাগলা আনিস!

হ্যাঁ। আনিস ভুরু কুঁচকে বলল, দারোয়ানদের মতো গোঁফ রেখেছিস দেখি!

আমি হেসে বললাম, ছাত্র পড়াতে হয়, গোঁফ না থাকলে চেহারায় গাম্ভীর্য আসে না। তোর কী খবর?

দাঁড়া, বলছি। যাবি না কিন্তু খবরদার! আমি একটা কাজ সেরে আসি।

আমাকে দাঁড় করিয়ে আনিস চলে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। এসে বলল, বিষ্যুৎবার করে গৌরীপুর থেকে এই লোকটা আসে। কতদিন থেকে ধরার চেষ্টা করছি—

কীরকম লোক?

ব্ল্যাক আর্টিস্ট। শয়তানের উপাসক।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তুই এখনও তন্ত্রমন্ত্র করে বেড়াচ্ছিস?

কেন করব না? চাচাও নেই যে ধরে পেটাবে! এখনই তো সময়।

আশ্চর্য ব্যাপার!

আশ্চর্যের কী আছে? কাজ না থাকলে চল আমার বাসায়।

কাজ ছিল বলে সেদিন যেতে পারিনি। পরের সপ্তাহেই গিয়েছি। আনিস হতচ্ছাড়া ধরনের মানুষ ছিল। ধারণা ছিল কোনোদিনই গুছিয়ে উঠতে পারবে না। দেখলাম বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। জহুরির কাজ করে। মূল্যবান পাথর দেখে তার মান-বিচার করে। এদেশে এর কদর নেই, বিদেশ থেকে কিছু-কিছু মানুষ মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। মোটা টাকা দেয় তারা—সেটাতেই তার বেশ চলে যায়।

আনিসের বাসাটা যেরকম হবে ভেবেছিলাম গিয়ে দেখি ঠিক সেরকম। দিনে কীরকম হয় জানি না—রাতে সেটা সবসময়েই আধো অন্ধকার। বেশি উজ্জ্বল বাতি নাকি আনিসের ভালো লাগে না। আনিসের সারা বাসা জুড়ে শুধু নানা আকারের আলমারি আর শেলফ। তার মাঝে নানা আকারের বোতল, বয়াম, শিশি আর বাক্স। তার ভিতরে নানারকম জিনিস। বিদঘুটে প্রাণীর ফসিল, হাড়গোড়, পাথর, প্রাচীন ব্যবহারি জিনিস, পুরানো বই, পুঁথিপত্র, ছবি—কী নেই!

আনিসের সাথে নানারকম কথাবার্তা হল। পুরানো বন্ধুরা এখন কে কোথায় আছে, কী করে সেটা নিয়ে কথা বলে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিলাম। চলে আসার আগে তার আজগুবি শখ নিয়ে কথা উঠল, বললাম, বাসা দেখি দুনিয়ার হাবিজাবি জিনিসে ভরে রেখেছিস!

আনিস হেসে বলল, ঠিকই বলেছিস।

কী করবি এগুলি দিয়ে?

কিছু-একটা করতেই হবে? এমনি রেখেছি। শখ।

তোর সবকিছুই আজগুবি!

আজগুবি তুই দেখিসনি—তাই এগুলিকে বলছিস আজগুবি।

www.MurchOna.com

গল্পের সন্ধান পেয়ে আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তুই দেখেছিস নাকি?

সারাজীবন কাটিয়ে দিলাম এর পিছনে, আমি দেখব না তো কে দেখবে?

কী দেখেছিস?

দেখবি?

দেখা।

আনিস উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা ছোট কালো কাঠের বাক্স নিয়ে এল। আমার কাছে বসে সাবধানে বাক্স খুলে তামার একটা চৌকোণা জিনিস বের করে আমার হাতে দিল। বলল, এটা দ্যাখ। খুব সাবধান, নিচে ফেলবি না।

কী এটা?

এক তান্ত্রিক সাধু আমাকে বিশেষ স্নেহ করত। সে মরার আগে আমাকে দিয়ে গেছে।

কিন্তু জিনিসটা কী?

বলতে পারিস একরকমের তাবিজ। হাতের মাংস কেটে শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছিল সে। মরার আগে কেটে বের করে দিয়ে গেছে সে।

শুনে ঘেন্নায় আমার শরীর একটু ঘিনঘিন করে উঠল। জিনিসটা বাক্সে রেখে বললাম, কী হয় এটা দিয়ে?

হাতের মুঠোর ভিতরে শক্ত করে চেপে ধরে বলবি—সুতোরন্তু।

কী হবে তা হলে?

বলে দ্যাখ।

আমি জিনিসটা হাতে নিয়ে শক্ত করে মুঠো চেপে বললাম, কী বলব এখন?

সুতোরন্তু। ধরে রাখবি এটা, ছাড়বি না।

আমি ধরে রেখে বললাম, সুতোরন্তু। আর কী আশ্চর্য, মনে হল জিনিসটা যেন নড়ে উঠল হাতের ভিতর!

আনিস বলল, ধরে রাখ, ছাড়িস না।

কেন? কী হবে?

দেখবি নিজেই।

আমি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করলাম মুঠোর ভিতরে জিনিসটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে।

কিছু টের পাচ্ছিস?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে গরম হচ্ছে জিনিসটা। মনে হচ্ছে একটু একটু নড়ছে।

আনিস একটু হেসে বলল, আরেকবার বল সুতোরন্তু, দেখবি আরও গরম হবে।

আমি বললাম, সুতোরন্তু। কী মনে হল, কয়েকবার বললাম কথাটি—সুতোন্তু সুতোরন্তু সুতোরন্তু—আর সাথে সাথে মনে হল হাতের মুঠোয় তামার চাকতিটি

www.MurchOna.com

গনগনে গরম হয়ে কিলবিল করে নড়ছে। চিৎকার করে হাত থেকে ফেলে দিলাম জিনিসটা।

আনিস লাফিয়ে উঠে হাহা করে বলল, কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! কী করলি এটা? কী করলি?

কেন, কী হয়েছে?

ঠিক হল না এটা। আনিস গম্ভীর হয়ে বলল, একেবারেই ঠিক হল না। তোকে বললাম আর একবার বলতে, তুই এতবার বললি কেন?

কেন, কী হয়েছে?

এটা একবার হাতের মুঠোয় নিয়ে সুতোরন্তু বলার পর নিচে রাখার একটা নিয়ম আছে। কখনো হাত থেকে ফেলে দিতে হয় না।

কী হয় ফেলে দিলে?

তুই বুঝতে পারছিস না। এটা একটা সাংঘাতিক জিনিস! হাতে নিয়ে তুই যখন বলেছিস সুতোরন্তু, তখন তুই একটা ব্যাপার শুরু করেছিস।

কী ব্যাপার?

তোকে বোঝানো মুশকিল। আনিস খুব গম্ভীর হয়ে বলল, তান্ত্রিক সাধুরা দীর্ঘদিন সাধনা করে নানারকম অপদেবতা বশ করে। সেইসব অপদেবতা তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তান্ত্রিকদের সাথে থাকে, তাদের আদেশ মেনে চলে। তুই সেরকম একটা অপদেবতাকে ডেকেছিস। সে আসছে। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু তুই জিনিসটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিস, এখন আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

আবছা অন্ধকার, বিচিত্র সব জিনিসপত্র চারদিকে, আনিসের থমথমে গলার স্বর, আমি আরেকটু হলে তার কথা প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম। শেষমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠলাম, বললাম, বলছিস এটা আলাদিনের চেরাগ? ঘষে দিলেই দৈত্য চলে আসে?

আনিস একটু আহত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না?

না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আনিস বলল, সুতোরন্তু আসবে। ইকবাল, তোর ওপর বড় বিপদ।

সুতোরন্তু কি দৈত্যটার নাম?

ঠাট্টা করিস না। সুতোরন্তু ঠিক নাম নয়, বলতে পারিস গোত্র। সে আসছে। তোর ওপর খুব বিপদ—

ভালো। আমি হেসে বললাম, বিপদ-আপদ আমার ভালোই লাগে।

আনিস একটু অধৈর্য হয়ে বলল, তুই এখন থেকে আমার সাথে থাকবি।

তোর সাথে?

www.MurchOna.com

হ্যাঁ।

কেন?

তুই জানিস না এখন কী করতে হবে। আমি জানি। সুতোরন্তু কিছু-একটা নিয়ে যাবে, তুই বুঝতে পারছিস না।

কবে আসবে সুতোরন্তু?

জানি না। আজও আসতে পারে, দুসপ্তাহ পরেও আসতে পারে।

আর যতদিন না আসছে আমার সব কাজকর্ম ফেলে তোর বাসায় থাকতে হবে?

হ্যাঁ।

আনিস, তোর বাসায় থাকতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। আমি এসে থাকব কিছুদিন, কিন্তু এখন নয়। তুই সুতোরন্তুকে আসতে দে, আমি একাই ম্যানেজ করব। ভালো করে চা-নাশতা খাইয়ে দেব।

ইকবাল—আনিস থমথমে গলায় বলল, এটা ঠাট্টার জিনিস না। তোকে আমার কথা শুনতে হবে। তোকে এখন থেকে আমার সাথে থাকতে হবে।

সম্ভব না। আমার অনেক কাজ।

আনিস অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, তোর এখন আমার কথা শুনতেই হবে। যা যা বলি শোন। তোর কিংবা অন্য কোনো একজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে এর উপর।

আনিস যা বলল তার সারমর্ম এই : পৃথিবীতে যেরকম মানুষ এবং নানারকম জীবজন্তু রয়েছে, তেমনি পরকালের জগতেও মানুষের সমজাতীয় প্রাণী এবং জন্তু-জানোয়ারের সমজাতীয় বিদেহী শক্তি রয়েছে। তান্ত্রিক সাধু বা নানারকমের সাধকেরা সাধনা করে পরজগতের এইসব প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করেন। সেইসব প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা বেশি হলে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা যায়। নিচু জাতীয় প্রাণী হলে তাদের জোর করে বশে রাখতে হয়। সুতোরন্তু নীচজাতীয় একটা ভয়ংকর প্রাণী। তাকে জোর করে বশ করে রাখা হয়েছে। সাধকেরা শক্তি পরীক্ষা করার জন্যে এদের বশ করে রাখেন। সুতোরন্তু নামের বিদেহী যুক্তিতর্কহীন এই প্রাণীটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাকে ভুল করে আহ্বান করা হয়েছে। আহ্বান করা হলে তাকে আসতে হয়—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে সে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে যায়। যে-তান্ত্রিক মারা গিয়েছে সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, আর কেউ পারবে সেরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আনিস অত্যন্ত জোর দিয়ে কথাগুলি বলেছিল বলে চুপ করে আমি শুনে গেলাম। কিন্তু তার কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। কথা শেষ হলে বললাম, ধরা যাক তোর সব কথা সত্যি। তোর সুতোরন্তু ভয়ংকর শক্তিশালী একটা বিদেহী প্রাণী। কিন্তু সে মানুষের জগতে বাস করে না, কাজেই মানুষের জগতে সে কিছুই করতে পারবে না।

www.MurchOna.com

আনিস মাথা নেড়ে বলল, তোর কথা খানিকটা সত্যি, কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। সাধক মানুষেরা যেরকম তাদের জগতে যোগাযোগ করতে পারে, এরাও খানিকটা পারে। এদের যোগাযোগটা হয় ভয়ংকর। মানুষ ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে গেলেই ওরা পুরোপুরি সর্বনাশ করতে পারে।

আমি বললাম, আমি ভয় পাই না। ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস নেই, তাই ভয়ও নেই। বাজি ধরে আমি লাশকাটা ঘরের টেবিলে বিছানা করে ঘুমিয়েছি।

আনিস খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যিই যদি তুই ভয় না পাস, তোকে সুতোরন্তু কিছু করতে পারবে না। মানুষ থেকে শক্তিশালী কোনো প্রাণী নেই। তবু তোকে দুটি কাজ করতে হবে।

কী?

প্রথমত তোর সাথে একটা জীবিত প্রাণী রাখবি।

কেন?

এরা যখন আসে সবসময়ে কোনো একটা-কিছুর প্রাণ নিয়ে যায়। চেষ্টা করে মানুষের নিতে, না পারলে অন্যকিছুর। ঘরে খাঁচায় একটা পাখি রাখা সবচেয়ে সহজ।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, আমার ঘরে অনেক মশা আছে। দেয়ালে টিকটিকি—

আনিস হাসার ভঙ্গি করে বলল, সুতোরন্তু যখন এসে হাজির হবে তুই বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করবি আশেপাশে কোনো প্রাণী থাকবে না। কীটপতঙ্গ, পশুপাখি কোনো কোনো ব্যাপারে মানুষ থেকে অনেক বেশি বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে—

কী?

হাত বাড়িয়ে দে।

আমি ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আনিস একটা ছোট শিশি থেকে কী যেন একটা তরল পদার্থ নিয়ে হাতের পিঠে লম্বা কী-একটা দাগ দিয়ে দিল।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, এটা কী?

একটা কেমিক্যাল। তোর হাতের উলটোপিঠে একটা চিহ্ন এঁকে দিলাম। কাল, পরশু এটা স্পষ্ট হবে। উল্কির মতো—তবে ভয় নেই, সারাজীবন থাকবে না। মাসখানেকের মধ্যেই মুছে যাবে।

কী হবে এটা দিয়ে?

যদি কখনো কিছু দেখে খুব ভয় পাস, এই চিহ্নটা বুকের কাছে ধরবি, দেখিস, ভয় চলে যাবে। একটা শক্তি পাবি।

আমি তাবিজ-কবজ বিশ্বাস করি না।

না করিস তো ভালো, সেইজন্যে চামড়ার উপর পাকাপাকিভাবে করে দিলাম। আজকাল হাত একটু জ্বালা করতে পারে, ইনফেকশান হবার কথা নয়। যদি হয় অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিবি।

www.MurchOna.com

আমি ওঠার সময় বললাম, দ্যাখ আনিস, ভূত-প্রেত আছে কি নেই সেটা নিয়ে আমি তোর সাথে তর্ক করতে চাই না। থাকলে থাকুক, আমি তাদের ছাড়াই জীবন কাটিয়ে এসেছি, বাকিটাও তাদের ছাড়াই কাটিয়ে দেব।

আনিস বলল, চমৎকার! এই হচ্ছে বাপের ব্যাটা!

রিকশা করে বাসায় আসার সময় আমি পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম। ভয়াবহ সুতোরস্তু এসে আমাকে সত্যি খুন করে রেখে যাবে কি না সে নিয়ে আমার ভিতরে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। যে-জিনিসটা আমাকে অবাক করেছে, সেটা হচ্ছে তামার মাদুলিটা, সেটার হঠাৎ করে গরম হয়ে যাওয়াটা। এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করি? আনিস হয়তো আমাকে সম্মোহন করেছে। তা হলে গরম লাগাটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু হাতের তালুতে পোড়া দাগটা? সম্মোহন করে মানুষের হাতের তালুতে গরম অনুভূতি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পোড়াবে কেমন করে?

ব্যাপারটা আমি ভুলেই যেতাম, কিন্তু ভুলতে পারলাম না হাতের উলটোপিঠে আনিসের এঁকে-দেওয়া চিহ্নটির জন্যে। চিহ্নটি আস্তে আস্তে ফুটে উঠল। যখনই হাত দিয়ে কিছু করি, সেটা ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। পরিচিত বন্ধুবান্ধবও বেশ অবাক হল এই বয়সে হাতের পিঠে ছবি এঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলাও সহজ নয়।

এভাবে সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে। সম্ভবত সুতোরস্তু এসে ঘুরে গেছে, আমি টের পাইনি। হাতের চিহ্নটিও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি আনিসকে বেশ জোর গলাতেই বলেছিলাম যে ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না, তবু কয়দিন ভিতরে ভিতরে একটু সতর্কই ছিলাম। কে জানে কিছু তো আর বলা যায় না!

এর মাঝে আমার ছোট খালার বিয়ে উপলক্ষে বাসার সবাই দল বেঁধে নেত্রকোনা চলে গেল। রয়ে গেলাম আমি এবং জিতু মিয়া। জিতু মিয়া কাজের ছেলেটি, বয়স দশের কাছাকাছি। মহা ধুরন্ধর ব্যক্তি, সুযোগ পেলে জাতীয় পরিষদের মেম্বার হয়ে যাবে সেটা আমি লিখে দিতে পারি। সেদিন সন্ধেবেলা বাসায় ফিরতেই জিতু মিয়া একগাল হেসে বলল, বাই, আফনে লাটকের চান্দা দেন নাই মনে আছে?

বাই মানে ভাই, লাটক মানে নাটক—আমার একটু চিন্তা করে বের করতে হল। কিছুদিন আগে গুণ্ডা ধরনের কিছু ছেলে নাটক করবে বলে চাঁদা চাইতে এসেছিল। অপরিচিত ছেলে, তাই কী নাটক, কোথায় হবে, কে পরিচালনা করবে এসব নিয়ে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। তখন একজন গরম হয়ে গেল বলে পুরো দলটাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছিলাম। বাসার সবার ধারণা কাজটা সুবিবেচনার হয়নি। আমি একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? কী হয়েছে?

আফনের গরে গিয়া দেহেন। বাংলায় অনুবাদ করলে যার অর্থ—আপনার ঘরে গিয়ে দেখেন।

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

আমি আমার ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঘরের দেয়ালে মৃত প্রাণীর নাড়িভুঁড়ি ছুড়ে ছুড়ে মেরেছে। কিছু এখনও দেয়ালে লেগে আছে, কিছু দেয়াল থেকে খুলে নিচে পড়েছে। দেয়ালে বীভৎস রং, ঘরের ভিতরে উৎকট দুর্গন্ধ।

আমি রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। হাতের কাছে জিতুকে পেয়ে তাকেই দুএক ঘা লাগনোর জন্যে হুঙ্কার দিয়ে বললাম, জানালা খুলে রেখেছিলি কেন?

খুলি নাই বাই। খোদার কসম।

তা হলে?

জানালা বন্ধ থাকা অবস্থায় কেমন করে দেয়ালে এগুলি ছুড়ে মারা যায় সেটা নিয়ে জিতু মিয়াকে ভাবিত দেখা গেল না। খাঁটি রাজনীতিবিদদের মতো সে সমস্যার সামনাসামনি এলে মস্তিষ্ক সুইচ টিপে বন্ধ করে দেয়।

একজন লোক ডাকিয়ে সময় লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করা হল। আজকালকার ছেলেরা এরকম নোংরা কাজ করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

রাতে খেতে বসার পর জিতু মিয়া আমাকে দ্বিতীয় খবরটি দিল। বলল, আম্মার মশা মারণের ওষুধ একেবারে ফাস কেলাশ।

মা মশা মারার ওষুধ কিনেছেন সেটা মশাদের বিরুদ্ধে খুব কার্যকর শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যেটা মশার জন্যে বিষাক্ত সেটা মানুষের জন্যেও বিষাক্ত। বিদেশে যেসব কীটনাশক ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি রুটিনমাফিক এদেশে পাঠানো হয়। আমি জিতু মিয়াকে বললাম, নিয়ে আয় তো মশা মারার ওষুধটা! সাবধানে ধরবি।

জিতু মিয়া স্টোররুম থেকে ফিনাইলের একটা কৌটা নিয়ে এল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা মশা মারার ওষুধ?

জে।

এটা দিয়ে মশা মারা হচ্ছে?

জে। বাসায় কুনো মশা নাই।

কোনো মশা নেই?

না বাই।

আমার বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। আনিস বলেছিল, সুতোরত্তু যখন আসবে তখন বাসায় কোনো কীটপতঙ্গ পশুপাখি থাকবে না।

আমি দেয়ালের দিকে তাকালাম। লাইটের কাছে একটা পুরুষ্ট টিকটিকি পোকা ধরে খায়। আজ পোকাও নেই, কোনো টিকটিকিও নেই। আলমারির কোনায় মাকড়শার জালে কিছু নিরীহ মাকড়শা থাকে, সেখানেও কিছু নেই। আমি জিতুকে বললাম, জিতু, স্টোররুমে কি তেলাপোকা আছে?

তেউল্যাচুরা?

হ্যাঁ।

আছে বাই। ক্যান?

একটা ধরে আনতে পারবি?

মনের মতো একটা কাজ পেয়ে জিতু মিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কী বলেন বাই! পারুম না ক্যান!

জ্যান্ত ধরে আনতে হবে কিন্তু।

দীর্ঘ সময় জিতু মিয়া স্টোররুমের জিনিসপত্র টানাটানি করে মুখ কালো করে ফিরে এল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, স্টোররুম আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও সে কোনো তেলাপোকা পায়নি! আমিও ঘরের আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখেছি কোনো ধরনের পোকামাকড় কীটপতঙ্গ কিছু নেই। সব যেন ম্যাজিকের মতো উবে গেছে। তবে কি আনিসের কথাই সত্যি? সুতোরক্তু আসছে আজ রাতে? একটা প্রাণ নিয়ে যাবে? কার প্রাণ? আমার? জিতুর?

আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল হঠাৎ।

রাত এগারোটায় আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকেই আমি চমকে উঠি। দেয়ালে ছোপ-ছোপ রক্ত। কোথা থেকে এল? সারা ঘরে বাসি রক্তের একটা বোটকা গন্ধ। শুধু তা-ই নয়, ঘরের ভিতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা, শরীর শিউরে শিউরে ওঠে। আমি ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের লাইটটি বারবার নিবুনিবু হয়ে আসছে। ঝড়ের রাতে যখন ইলেকট্রিসিটি চলে যায়-যায় করে ফিরে আসে, তখন এরকম হয়। কিন্তু আজ পরিষ্কার আকাশ। যদি ইলেকট্রিসিটি সত্যি চলে যায়, তখন কী হবে? বাসায় কোথায় যেন একটা টর্চলাইট আছে, সেটা এখন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ-বাসায় কোনো জিনিসপত্র ঠিক জায়গায় রাখা হয় না, দরকারের সময় জিনিস খুঁজে পাওয়ার ঘটনা এ-বাসাতে এখনও ঘটেনি। সিগারেট খাই বলে পকেটে ম্যাচ থাকে। এখন সেটাই একমাত্র ভরসা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আমি হঠাৎ শুনলাম শোঁশোঁ করে বাতাসের শব্দ হল, তারপর হঠাৎ সবগুলি জানালা দড়াম করে খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ানক চমকে উঠলাম আমি, আর জীবনে প্রথমবার ভয় পেলাম। মনে হল আমার পেছনে ভয়াবহ কিছু-একটা দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কণ্ঠনালি ছিঁড়ে নেবে।

তা হলে সত্যিই সুতোরক্তু আসছে?

আমি বসার ঘরে এসে দেখি সেখানে জিতু মিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কেমন জানি বিভ্রান্ত। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে জিতু?

বাই, বাসাডা কাফে ক্যান?

কাঁপে?

www.MurchOna.com

জে যাই, কাফে। আমার কেমুন জানি ডর করে যাই।

তা হলে আমি একা নই, জিতুও ব্যাপারটা টের পেয়েছে। কিছু-একটা হচ্ছে এই বাসায়। আনিসের কথা মনে পড়ল, সুতোরত্তু এসে একটা প্রাণ নিয়ে যাবে। সত্যি?

আমি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা দশ টাকার নোট জিতুর হাতে ধরিয়ে বললাম, টাকাটা সাথে রাখ। আজ রাতে তুই বাসায় আসবি না।

জিতু অবাক হয়ে বলল, কই যামু তাইলে?

জানি না, যেখানে ইচ্ছা, কিন্তু এই বাসায় না। যা, বের হ। এক্ষুনি বের হ। মনে রাখিস কাল সকালের আগে বাসায় ঢুকবি না।

জিতু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু না বলে বের হয়ে গেল।

আমি দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে দেখলাম খাবারের টেবিলের উপর একটা কাক মরে পড়ে আছে। আমার হঠাৎ গা গুলিয়ে বমি এসে গেল। আমি আস্তে আস্তে অনেকটা নিজের মনেই বললাম, ঠিক আছে সুতোরত্তু, তুমি এসো। দেখি তুমি কী করতে চাও।

স্টোররুমে একটা শাবল থাকে, সেটা খুঁজে বের করে আনলাম। অশরীরী প্রাণীর সাথে এটা কী কাজে লাগবে জানি না, কিন্তু একেবারে খালিহাতে কীভাবে কারও সাথে মুখোমুখি হই? বাসার আলো নিবুনিবু করছে, টর্চলাইটটা পেলে ভালো হত, কিন্তু খুঁজে পেলাম না। ড্রয়ারে একটা বড় মোমবাতি পাওয়া গেল, পকেটে দেশলাই রয়েছে, সেটাই ভরসা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় বারোটা, এই কালরাত কি কখনো শেষ হবে?

আমি বসার ঘরে দেয়াল-ঘেঁষে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটে দুটো টান দিয়ে স্নায়ু একটু শীতল হল। কী আশ্চর্য! এই বিংশ শতাব্দীতে বসে আমাকে সত্যিই অপদেবতা দেখতে হবে?

সিগারেট খেতে খেতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা বিচিত্র জিনিস ঘটতে শুরু করল। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আবছা আবছা একটা প্রাণীর রূপ নিতে শুরু করে। সত্যি দেখছি, না চোখের ভুল? আমি ফুঁ দিতেই প্রাণীটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু সাথে সাথে ঝনঝন শব্দ করে দেয়াল থেকে ফ্রেমে ঝোলানো একটা জলরঙের ছবি খুলে পড়ল, কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, হঠাৎ মনে হতে লাগল আমি ছাড়াও ঘরে আরও কেউ আছে! ভয়ানক কিছু-একটা আছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে, অনেক কষ্ট করে আমি নিজেকে শান্ত করে রাখলাম, দেখা যাক কী হয়। আমি চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে আস্তে আস্তে কিন্তু জোর দিয়ে বললাম, সুতোরত্তু, তুমি যাও। তুমি চলে যাও।

www.MurchOna.com

নিজের কাছে নিজের কণ্ঠস্বরটি শোনাল ভারি অদ্ভুত। তার সাথে সাথে সারা বাসা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। টেবিলে পেয়ালা-পিরিচ, টেবিলল্যাম্প, ঘরের শেকল ঝনঝন শব্দ করে কেঁপে উঠল, আমি দেখলাম লাইটটা ডান থেকে বামে ঝুলতে শুরু করেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সেটা শব্দ করে ফেটে গেল, সাথে সাথে সারা বাসা অন্ধকার হয়ে গেল। ফিউজ কেটে গেছে নিশ্চয়ই।

হা হা হা শব্দ করে সারা ঘরে কী যেন একটা ছুটে গেল, একটা গরম বাতাসের হলকা টের পেলাম আমি। পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালালাম কাঁপা হাতে, ঘরের অন্ধকার দূর না হয়ে যেন আরও বেড়ে গেল। আমি আবছা দেখতে পেলাম ঘরের এক কোনায় মেঝেতে গুড়ি মেরে কী যেন বসে আছে। মনে হল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঝাঁপিয়ে কি পড়বে আমার উপর? আমি সাবধানে মোমবাতিটা জ্বালালাম, দপদপ করে শিখা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল নিভে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে। আমি মোমবাতিটা শক্ত করে ধরে রেখে ঘরের কোনায় তাকালাম, সত্যি কি কিছু আছে? কিছু দেখা গেল না।

ঠকঠক করে দরজায় শব্দ হল হঠাৎ। আমি চমকে উঠলাম, পরমুহূর্তে শুনলাম জিতুর গলার স্বর। ভেউভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাই, বাই গো, ও বাই—

আমি ভয় পেয়ে দরজা খুলতে খুলতে বললাম, কী হয়েছে জিতু?

আমার ট্যাহা—

দরজা খুলতেই জিতু হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে বলল, আমার ট্যাহা দেয় না—

হঠাৎ করে জিতু চুপ করে গেল। আমি ভয় পেয়ে ডাকলাম, জিতু—

জিতু কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকাল। মোমবাতির আলোতে হঠাৎ বিচিত্র দেখাল জিতুকে। চোখ দুটিতে আতঙ্ক, রক্তহীন মুখে যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। আমি বললাম, কী হয়েছে জিতু? কী হয়েছে?

জিতু উদ্‌ভ্রান্তের মতো একবার চারদিকে তাকাল। কী-একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার বুকটা ধক করে উঠল। মোমবাতির শিখাটা দপদপ করে হঠাৎ নিভে গেল আর আমি শুনলাম একটা প্রাণফাটানো আর্তচিৎকার।

আমি শক্ত করে জিতুকে আঁকড়ে ধরি, জিতু থরথর করে কাঁপছে, তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

জিতু—আমি চিৎকার করে ডাকলাম, জিতু—কী হয়েছে তোর?

জিতু কোনো উত্তর দেয় না। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো শব্দ করতে থাকে। মনে হয় যেন সে নিশ্বাস নিতে পারছে না।

আমার হঠাৎ আনিসের কথা মনে পড়ল। বলেছিল সুতোরন্তু একজনের প্রাণ নিয়ে যাবে। তা হলে জিতুই কি সেই একজন?

www.MurchOna.com

ঠিক তখন আমার মনে পড়ল আমার হাতের চিহ্নটার কথা। আনিস বলেছিল হাতটা বুকের কাছে ধরে রাখতে, ভয় চলে যাবে তা হলে। আমি জিতুকে শক্ত করে চেপে ধরে হাতটা জিতুর বুকের উপর চেপে ধরলাম, ফিসফিস করে জিতুর কানের কাছে বললাম, জিতু, কোনো ভয় নেই—

বলার সাথে সাথে সত্যি সত্যি আমার ভিতর কেমন জানি সাহস ফিরে এল। সত্যি মনে হতে থাকল কোনো ভয় নেই। জিতুকে আঁকড়ে ধরে আবার বললাম, আমি আছি—কোনো ভয় নেই তোর।

ঘরের ভেতর গরম বাতাসের একটা হলকা খেলে গেল একবার। দরজা-জানালা সব খুলে গেল, তারপর হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে বললাম, থামো।

ঝনঝন করে কী-একটা যেন ভেঙে পড়ল।

আমি নিশ্বাস নিয়ে আবার চিৎকার করে বললাম, দূর হয়ে যাও এক্ষুনি।

কী-একটা যেন আছড়ে পড়ল ঘরের মাঝে।

জমাটবাঁধা একটা অন্ধকার হঠাৎ যেন ছুটে আসতে শুরু করে আমার দিকে। আমি জিতুকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, খবরদার—

আর কী আশ্চর্য—সেটা যেন থেমে গেল।

আশ্চর্য একটা শক্তি অনুভব করলাম আমি নিজের ভিতরে। প্রথমবার আমার মনে হল এই অশরীরী শক্তি আমাকে কিছু করতে পারবে না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললাম, যাও তুমি। দূর হয়ে যাও—

হঠাৎ করে মনে হল সুতোরন্তু সত্যিই চলে গেছে, কোনো ভয় নেই আর।

আমি তবু চুপচাপ বসে রইলাম। ঘরে আর কোনো শব্দ নেই, সুমসাম নীরবতা।

জিতু আস্তে আস্তে বলল, বাই ডর করে।

আমি জিতুকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, ভয় কী জিতু? আমি আছি না?

জিতু হঠাৎ ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করল। আমি তাকে কাঁদতে দিলাম—বেচারা বড় ভয় পেয়েছে।

হঠাৎ শুনি কানের ভিতর একটা মশা গুনগুন করছে। খোলা জানালা দিয়ে মশা ঢুকেছে ভিতরে। মশার শব্দে আমি জীবনে আর কখনো এত আনন্দ পাইনি। জিতুকে নামিয়ে বললাম, আর কোনো ভয় নেই জিতু। আয় বাতি জ্বালাই এবার।

আনিস সব শুনে বলল, তোকে বলেছিলাম মনে আছে, মানুষের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই? দেখলি তো?

আমি বললাম, কিন্তু শেষমুহূর্তে তোর এই চিহ্নটার কথা মনে না পড়লে কী হত কে জানে! যেই বুকের কাছে ধরলাম সাথে সাথে—

www.MurchOna.com

আনিস হঠাৎ হোহো করে হাসতে শুরু করে। আমি থতমত খেয়ে বললাম, কী হল, হাসছিস কেন?

এই চিহ্নটার অলৌকিক শক্তির কথা শুনে।

কেন?

তুই কি ভেবেছিস এটা কোনো জাদুমন্ত্র?

তা হলে কী?

এখানে লেখা স্বরে অ—স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর। উলটো করে লিখেছি, তাই ধরতে পারিসনি।

আমি অবাক হয়ে আমার হাতের দিকে তাকালাম। সত্যিই তাই, একে উলটো করে লিখেছে, তার উপর মাত্রা দেয়নি, সেজন্যে ধরতে পারিনি। বোকার মতো আনিসের দিকে তাকালাম আমি।

আনিস বলল, মানুষের জোর নিজের ভিতরে। বিশ্বাসটা সেই জোরকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আমি ওটা লিখে দিয়েছিলাম যদি ওটাকে বিশ্বাস করে আরও খানিকটা জোর পাস সেজন্যে। আরকিছু না।

আমি মুখ হাঁ করে বসে রইলাম।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

মুতুয়াল পির

আমি যখন ছোট ছিলাম আমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এমন-কিছু আহামরি ক্ষমতা নয়, কিন্তু অলৌকিক। ক্ষমতাগুলির উদাহরণ এরকম : পরীক্ষার রেজাল্ট হবে, ক্লাসে দুরুদুরু বুকে সবাই বসে আছি। হেডমাস্টার ক্লাসটিচারকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার রেজাল্ট বলতে এসেছেন। তাঁকে দেখেই কীভাবে যেন বুঝে গেলাম যে আমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি। আমি মোটামুটি ভালো ছাত্র, কিন্তু পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার মতো ভালো ছাত্র মোটেও নই। তা ছাড়া পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে হলে পড়াশোনায় ভালো হওয়া ছাড়াও আরও নানারকম গুণাবলী থাকতে হয়। হাতের লেখা ভালো হতে হয়, অঙ্ক পরীক্ষায় সরল অঙ্ক সবার শেষে স্পর্শ করতে হয়, পৌরনীতির মতো নীরস জিনিসটাও রীতিমতো শখ করে পড়তে হয়, ইত্যাদি। সেরকম গুণাবলীর কোনোটাই আমার নেই, তবু আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম। হেডমাস্টার সত্যিই যখন আমার নাম ঘোষণা করলেন, সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমি একটুও অবাক হলাম না।

তারপর ধরা যাক আমার বন্ধু দেলোয়ারের কথা, তার বাসায় একদিন বেড়াতে গেছি। দেলোয়ারের বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা হবে, তাই মায়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। তাদের বাসার সবাই এবং পাড়াপড়শি মিলে একদিন জল্পনা-কল্পনা করছে বাচ্চাটি ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটি নিয়ে। তার মাঝে আমিও উপস্থিত, আর হঠাৎ করে আমি বুঝে গেলাম যে, বাচ্চাটি মেয়ে। আলাপ-আলোচনা যখন খুব জমে উঠেছে, আমি তখন বলে ফেললাম, শিরি আপা, আপনার মেয়ে হবে।

সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি তখনও জানতাম না সবাই চায় বাচ্চাটা ছেলে হোক। মেয়ে হবে বললে অনেক সময় মায়েরা বেশ রেগে যায়। একজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন করে জান?

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বললাম, আ-আ-আমি জানি।

www.MurchOna.com

কমবয়সী আরেকটা মেয়ে ছিল, তার বিয়ে হয়েছে কি না সেটাও আমি জানি না। আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার কী হবে? ছেলে না মেয়ে?

আমি ভালো করে তার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম তারও মেয়ে হবে। বললাম, আপনারও মেয়ে হবে।

তখন আরেকটা মেয়ে বলল, আমর কী হবে? আমি তার দিকে বেশ ভালো করে তাকালাম, তবু কিছু বলতে পারলাম না। বললাম, আপনার কিছু হবে না।

ব্যাপারটা অনেকটা হাসি-তামাশার মতো ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে পরিবেশটা কেমন জানি থমথমে হয়ে গেল। তখনও আমি জানতাম না যে আসলেই এই মেয়েটির বাচ্চা হয় না, আর সেজন্যে তাকে ছেড়ে দিয়ে তার স্বামী আরেকটা বিয়ে করার পাঁয়তারা করছে।

আমি যে-দুজনকে বলেছিলাম তাদের মেয়ে হবে, সত্যিই তাদের মেয়ে হয়েছিল। কারও পেটে বাচ্চা থাকলে তাকে দেখে বলে দেওয়া বাচ্চাটি ছেলে না মেয়ে আমার জন্যে এত সহজ ছিল যে এ-ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা থাকতে পারে আমার বিশ্বাসই হত না। আমি তাই নিজে থেকে কিছু বলতাম না, সেই ছোটবেলাতেই আবিষ্কার করেছি বড়রা কিছু-কিছু জিনিস সহজভাবে নিতে পারে না।

আমি আরও কয়েকটা জিনিস বলতে পারতাম। যেমন আমাদের ক্লাসের মজিদের কথা। সে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবে, আগে কখনো গ্রামে যায়নি, তাই খুব উৎসাহ। যেদিন যাবে সেদিন তার সাথে আমার দেখা হল আর তাকে দেখেই আমি বুঝে গেলাম তার সাথে এই আমার শেষ দেখা। সে কয়দিনের মাঝেই মরে যাবে। সত্যি সত্যি গ্রামের বাড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে শিংমাছের কাঁটা থেকে ধনুষ্টংকার হয়ে মজিদ দুদিনের মাঝে মরে গেল। এসব ব্যাপার আমি কখনো কাউকে বলতাম না, ছোটবেলা থেকেই জানি বড়দের জানিয়ে লাভ নেই। জিনিসটা কেউ বুঝবে না, হয় হেসে উড়িয়ে দেবে, নাহয় ধরে শক্ত পিটুনি দেবে।

আরও একটা জিনিস ছেলেবেলায় আমাকে খুব যন্ত্রণা করত। সেটা হচ্ছে ঘুমানোর সময় মানুষের কথা শোনা। ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে যখন ঠিক জেগেও নেই আবার পুরোপুরি ঘুমিয়েও পড়িনি, তখন আমি পরিষ্কার কথাবার্তা শুনতাম। কারা যেন আমার সাথে কথাবার্তা বলত। ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক হতে পারে আমি জানতাম না, ধরে নিয়েছিলাম অন্যেরাও নিশ্চয়ই শোনে। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক, কাজেই সেটা জানিয়ে কী লাভ? একবার শুধু অবাক হয়েছিলাম। আমাদের পরিচিত এক মেয়ে, অরু আপা শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে দিল। হাসপাতালে নিয়ে গেছে, মরে-বাঁচে অবস্থা—রাতে ঘুমানোর সময় পরিষ্কার শুনলাম অরু আপা আমাকে বলল, ইকবাল, আমি কিন্তু গায়ে আগুন দিইনি। মা আমার গায়ে আগুন দিয়েছে।

www.MurchOna.com

আমার ঘুম চটে গেল। বুঝে গেলাম অরু আপা মরে গেছে। সাথে ছোট ভাই ঘুমাত, তাকে ডেকে তুলে বললাম, অরু আপা মরে গেছে।

সে বেশি গা করল না। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে গেল। এমন বিচিত্র এই ঘটনার কথাও আমি কাউকে বলিনি। শুধু তার পর থেকে অরু আপার মা'কে দেখলে আমার বুক দুরুদুরু করত। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, পাতলা ঠোঁটের সেই মহিলা নিজের মেয়ের গায়ে আগুন দিয়ে কেন মারলেন কে জানে!

যাই হোক, আমি আমার সেই অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে বড় হচ্ছি। ঠিক জানি না ক্ষমতাটা কী এবং সেটা কেমন করে ব্যবহার করা যায়। তখন আমার বাবা বগুড়া বদলি হয়ে এলেন। আমাদের বাসা সূত্রাপুরে। পুরানো দালান, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ধসে পড়ে যাবে। ভিতরে তত খারাপ না। অনেকগুলি ঘর, আমি তখনই কোনার দিকে একটা ঘর আমার নিজের বলে দাবি করে দখল করে নিলাম।

এই ঘরটাতে অস্বাভাবিক কিছু থাকতে পারে আমার জানা ছিল না, কিন্তু আমি একটা অস্বাভাবিক জিনিস আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কার হল এভাবে :

গরমের দিন, বাসায় তরমুজ আনা হয়েছে। ঠেসে তরমুজ খেয়েছি সারাদিন। বিকেলে আমার ঘরে বসে একটা প্রজেক্টর তৈরি করার চেষ্টা করছি, তখন ভীষণ পেচ্ছাব ধরল, এই নিয়ে তৃতীয়বার। তরমুজ খেলে যে খুব ঘনঘন পেচ্ছাব ধরে তখনই আমি আবিষ্কার করলাম। আজকালকার দিনে বাসায় লাগানো বাথরুম থাকে, তখন ছিল না। বাসা থেকে দূরে গিয়ে কাজকর্ম সারতে হত। আমার ঘরের পিছনে গাছপালা, ভাবলাম জানলা দিয়ে কাজ সেরে ফেলি। যেই শুরু করেছি তখন দেখি বাড়িওয়ালার ছেলেটা ওপাশ থেকে হেঁটে আসছে। কাজেই পেচ্ছাব বন্ধ করে লাফ দিয়ে জানালা থেকে নামতে হল। যারা পেচ্ছাব করতে করতে মাঝখানে বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন জিনিসটা কত কঠিন। আমি তখন আর ছুটে বাথরুমে যেতে পারি না, থাকতেও পারি না। কাজেই বাধ্য হয়ে ঘরের কোনায় বাকি কাজটুকু সেরে ফেলতে হল। এক বালতি পানি এনে জায়গাটা ধুয়ে ফেলার আমার একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু গরমের দিনে দেখতে দেখতে সবকিছু শুকিয়ে যাওয়ায় সৎ উদ্দেশ্যটা কাজে লাগাতে পারিনি।

সেদিন গভীর রাতে আমাদের ঘুম ভাঙল আমার বাবার চিৎকারে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করছেন, তাঁর পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমরা দুই ভাই হারিকেন জ্বালিয়ে ছুটে গেলাম গোপেন ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

গোপেন ডাক্তার এসে কী-একটা ইনজেকশান দিয়ে বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। ডাক্তার চলে যাবার পর আমরা ক্লান্ত হয়ে শুতে গিয়েছি, ঘুম আসবে-আসবে করছে, হঠাৎ শুনলাম কে যেন ভারী গলায় বলল, থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ভেঙে ফেলব হারামজাদা, আমার ঘরে পেশাব করিস?

আমি চমকে একেবারে লাফিয়ে উঠে বসলাম।

www.MurchOna.com

সকালে উঠেই আমি এক বালতি পানি নিয়ে ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে ভালো করে সারা ঘর ধুয়ে দিলাম। বাবার ঘুম ভাঙল দশটার দিকে—কোনো ব্যথা নেই। একেবারে পুরোপুরি সুস্থ মানুষ।

বাবার পেটব্যথার সাথে আমার পেচ্ছাব করার সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু আমি ঘটনাটা কাউকে বললাম না। ভাইবোনদের মাঝে আমি নাকি একটু বোকা ধরনের, আমাকে নিয়ে প্রায়ই হাসাহাসি করা হয়, খামোকা তার সুযোগ করে দিয়ে কী লাভ? আমি নিজে অবশ্যি এর পর থেকে খুব সতর্ক হয়ে গেছি, ঘরটা পারতপক্ষে ময়লা করি না।

ব্যাপারটা আমি ভুলে যেতাম, সেই বয়সে বেশি গুরুতর জিনিস মনে রাখার কথা না। কিন্তু এর মাঝে আরেকটা ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ করে একদিন মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্ধের দিকে বারকয়েক বমি করলেন, তারপর গা কাঁপিয়ে প্রবল জ্বর। মায়ের অসুখবিসুখ সাধারণত হয় না, কাজেই যখন তিনি অসুখে পড়েন সারা বাসার সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। শুধু আলুভর্তা দিয়ে ভাত খেতে হয়, ভাত থাকে অর্ধসিদ্ধ এবং ডাল হলুদের জন্যে মুখে দেওয়া যায় না। বোনকে সেটা বলাও যায় না, কারণ সে কানে ধরে একটা চড় লাগিয়ে দেয়। শুধু তা-ই নয়, মায়ের অসুখ হলেই আমার শুধু মনে হতে থাকে যে মা বুঝি এখন মরে যাবেন। পৃথিবীর সব মাতৃহারা বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে যায় আর আমার ইচ্ছে হয় ভেউভেউ করে কাঁদি।

মাকে দেখে গোপেন ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেছেন। মশারি ফেলে মা শুয়ে আছেন নিস্তেজ হয়ে। দেখে আমার প্রায় বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ করে আমার মনে পড়ল ঘরে পেশাব করেছিলাম বলে বাবার পেটে ব্যথা হয়েছিল। আবার কি ঘরে কেউ কিছু করেছে?

আমি তখন-তখনই আমার ঘরে এসে হাজির হলাম। দরজা খুলতেই একটা পচা গন্ধ নাকে এসে লাগল। লাইট জ্বালিয়ে এদিক-সেদিক তাকালাম, হঠাৎ দেখি টেবিলের নিচে একটা মোটাসোটা ইঁদুর মরে পড়ে আছে। সম্ভবত বেড়াল মেরে এনে ফেলে রেখেছে। বড় বোনের আদরের বেড়াল, দুধভাত খেয়ে অভ্যাস, মনে হয় ইঁদুরে সেরকম রুচি নেই। খানিকটা খেয়ে চলে গেছে, শেষ করতে পারেনি। এখন পচা গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না।

এরকম বিদঘুটে নোংরা জিনিস আমি নিজে কখনো পরিষ্কার করি না। দেখামাত্র চিৎকার করে একটা হৈ-হুলস্থূল লাগিয়ে দিই, তখন মা এসে কিছু-একটা ব্যবস্থা করেন। আজ অন্য ব্যাপার, সম্ভবত এটার জন্যেই মায়ের শরীর খারাপ। খবরের কাগজ দিয়ে ধরে আধ-খাওয়া ইঁদুরটা বাইরে ফেলে এলাম, তারপর বালতি করে পানি এনে ঝাঁটা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিলাম। বাসার সবাই আমাকে খানিকটা পাগলা গোছের বলে জানে, তাই কেউ বেশি অবাক হল না।

www.MurchOna.com

রাত দশটার দিকে পা টিপে টিপে মায়ের কাছে গিয়ে দেখি তিনি শান্তিতে নিশ্বাস নিচ্ছেন। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর নেই। মনটা শান্তিতে ভরে গেল। পরদিন মা দিব্যি সুস্থ মানুষ, দেখে কে বলবে গতরাতে তাঁর এত শরীর খারাপ হয়েছিল! আমি এবারে আমার এত বড় আবিষ্কারটা না বলে পারলাম না, প্রথমে আমার বড় বোনকে একা পেয়ে তাকে বললাম, বড় আপা, তুমি যদি কাউকে না বল তা হলে তোমাকে একটা গোপন কথা বলব।

বড় বোন বলল, বিয়ে করে ফেলেছিস?

যাও, তোমার খালি ঠাট্টা!

ঠিক আছে কাউকে বলব না, বল তোর গোপন কথা।

আমার ঘরটা যদি ময়লা থাকে তা হলে কারও-না-কারও অসুখ হয়।

বড় বোন শুনে দাঁত বের করে হেসে তখন-তখনই সবাইকে ডেকে বলল, তোমরা সবাই শুনে যাও। আমাদের ইকবাল পির হয়ে গেছে! তার ঘর ময়লা হলে ঘরে আজাব নেমে আসে।

শুনে সবার সে কী হাসি! আমার এত রাগ হল যে বলার নয়—ব্যাপারটা আর বুঝিয়ে বললাম না কাউকে। বড়দের বুদ্ধি কেন যে এত কম হয় কে জানে!

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমার ঘরটাতে উৎসাহ কমে এসেছে, সেই বয়সে কোনো জিনিসেই একটানা উৎসাহ ধরে রাখা কঠিন। পাশের বাসায় একটা মিউজিয়াম দিয়েছি, তার জন্যে রাতদিন খোঁজাখুঁজি করে জিনিসপত্র জোগাড় করি। একটা গোরুর খুলি জোগাড় হয়েছে, শ্মশান থেকে মানুষের হাড় আনা যায় কি না তার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। বিকেলে সবাই মিলে কাদায় গড়াগড়ি করে ফুটবল খেলি। রাতে মরার মতো ঘুমাই। একদিন কী মনে হল, দুপুরবেলায় আমার ঘরটাতে ঢুকেছি। অনেকদিন আসি না, অব্যবহারে ঘরটা শ্রীহীন হয়ে পড়ে আছে। ঘরের টেবিলে, গল্পের বইয়ে, অসমাপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর ধুলার আস্তরণ পড়েছে। কী মনে হল জানি না, অনেক সময় নিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করলাম, বই গুছিয়ে তুললাম শেলফে, ঝাঁটা দিয়ে ধুলা ঝেড়ে দিলাম, অসমাপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র বাক্সবন্দি করলাম। সব শেষ করে যেই ঘর থেকে বের হব, হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার মাথায় হাত রেখেছে। আমি চমকে উঠে পিছনে তাকাতেই দেখি অনেক লম্বা একটা মানুষ, একেবারে ছাদে মাথা ঠেকে গেছে।

চিৎকার করে ঘর থেকে বের হয়ে মায়ের কাছে যেতে যেতে আমার কাপড়ে পেচ্ছাব হয়ে গেল। বেশি ভয় পেলে মানুষ পেচ্ছাব করে দেয় কেন কে জানে!

এবারে কেউ এটা নিয়ে বেশি হাসাহাসি করল না। কী দেখে ভয় পেয়েছি সেটা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু ভয় যে পেয়েছি সেটা তো মিথ্যা নয়। মা আমাকে লবণপানি খাইয়ে অবেলায় গোসল করিয়ে দিলেন। রাতে আমাকে পাশে নিয়ে ঘুমালেন দুই রাত।

বড় বোন আশেপাশে কেউ না থাকলে আমাকে মুতুয়াল মিয়া বলে ডাকা শুরু করল। আমার মনে হতে থাকল পৃথিবী থেকে বড় বোন জাতীয় জিনিসগুলি উঠে গেলে মন্দ হয় না।

এর পর থেকে আমি পারতপক্ষে আমার ঘরে যাই না। হয়তো মাঝে মাঝে এক-আধবার যেতাম, কিন্তু যাই না তার আরও একটা কারণ আছে যেটা কাউকে বলিনি। এই ঘটনার কয়েকদিন পর চোখে ঘুম নেমে আসছে, হঠাৎ পরিষ্কার শুনলাম কে যেন বলল, বোকা ছেলে, আমাকে ভয়ের কী আছে?

একেবারে লাফিয়ে উঠে বসলাম আমি। চিৎকার দেব দেব করেও দিলাম না, ছোট ভাইয়ের একেবারে গা-ঘেঁষে শুয়ে রইলাম সারারাত। শুধু মনে হতে লাগল ছাদ ছুঁয়ে গেছে এরকম লম্বা একজন মানুষ অন্ধকার ঘরে ঘুরঘুর করছে আমার জন্যে।

সেই থেকে আমি আমার ঘর ছেড়ে দিলাম পাকাপাকিভাবে।

এরকম সময়ে আমাদের বাসায় এলেন শওকত মামা। মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই। বাসায় কেউ বেড়াতে এলে আমাদের খুব মজা হয়। প্রথমত কেউ খালিহাতে আসে না, মিষ্টি বা ফলমূল নিয়ে আসে। তারপর কয়েকদিন ভালোমন্দ নানারকম খাওয়া হয়। শওকত মামার ব্যাপারটি অবশ্যি অন্যরকম, প্রথমত তিনি এলেন খালিহাতে। তারপর জানা গেল তিনি এখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছেন। আমরা আশেপাশে না থাকলে বাবা আর মা শওকত মামাকে নিয়ে গম্ভীর কথাবার্তা বলেন। বোঝা গেল তাঁরা ব্যাপারটি ঠিক পছন্দ করছেন না।

আপাতত তাঁকে আমার ঘরটি দেওয়া হল। আমার ঘর আরেকজনকে দেওয়া হল, তবু আমি আপত্তি করলাম না। আপত্তি করলেই যে সে আপত্তি শোনা হত সেরকম কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না। ঘরটার উপর থেকে আমার মনও উঠে গেছে। আমি শওকত মামাকে সাবধান করে দিলাম, সুযোগ পেয়ে একদিন বললাম, মামা এই ঘরটা কিন্তু সবসময় পরিষ্কার রাখতে হয়। ময়লা হলেই বাসায় কিন্তু অসুখবিসুখ শুরু হয়ে যায়।

শুনে শওকত মামা হেসে বললেন, ও আচ্ছা! বেশ, বেশ, তাই নাকি? ভেরি গুড!

বুঝলাম, আমার কথাকে কোনো পাত্তাই দিলেন না।

শওকত মামা মানুষটি খুব হাসিখুশি, অনেক জায়গায় ছিলেন, অনেকরকম অভিজ্ঞতা, নানারকম গল্প করতে পারেন। বাসার সবাই তাই শওকত মামাকে খুব পছন্দ করল, আমি ছাড়া। কী কারণে জানি না আমার লোকটাকে ভালো লাগল না, তাঁর দিকে তাকালে হাসিখুশি চোখের ভিতর থেকে অন্য কীরকম

www.MurchOna.com

একটা জিনিস যেন বের হয়ে আসে। শওকত মামাও আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। অন্য সবার সাথে কত মজা করে কথা বলতেন, কিন্তু আমার সাথে এমন ব্যবহার করতেন যেন আমি বাসার কাজের ছেলে।

শওকত মামা মানুষটি যে বেশি সুবিধের নয় সেটি বুঝতে পারলাম আরও কয়দিন পর। আমাদের বাসায় যে কাজের ছেলেটা ছিল সে একদিন বাবার পকেট থেকে দুটি দশ টাকার নোট সরিয়ে নিল। সে অবশ্যি স্বীকার করল না, কিন্তু শওকত মামা বললেন, তিনি নিজে তাকে শোওয়ার ঘর থেকে গোপনে বের হয়ে যেতে দেখেছেন। অনেকরকম ধমকাধমকি করার পরও ছেলেটা স্বীকার করে না। মামা তখন তাকে ধরে মারা শুরু করলেন। সে কী মার, ঠোঁট ফেটে রক্ত বের হয়ে এল! তবু মামা থামেন না। দেখে মনে হতে লাগল কাউকে মারতে মামার বুঝি একরকমের আনন্দ হয়। অনেক কষ্টে তাঁকে থামানো হল।

ছেলেটাকে তখন-তখনই বিদেয় করে দেওয়া হল। একটা চোরকে তো আর জেনেশুনে বাসায় রাখা যায় না। আমার মনটা খারাপ হয়ে রইল কয়দিন। ছেলেটা সময় পেলে আমাকে তার গ্রামের নানারকম মজার মজার গল্প শোনাত—রহস্যময় সেই গল্প আর কে শোনাবে আমাকে? এত সুন্দর গল্প করতে পারে যেই মানুষ, সে টাকা চুরি করে কেমন করে কে জানে!

এরপর আবার সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে, কাজের মানুষ ছাড়া বাসায় খুব অসুবিধে। শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেল।

সে আসার দুদিন পরের কথা। সকালে উঠে শুনি শওকত মামার খুব শরীর খারাপ, গভীর রাত থেকে প্রচণ্ড পেটে ব্যথা। গোপেন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে, মনে হয় হাসপাতালে নিতে হবে।

শুনে আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, আমার ঘরটা নিশ্চয়ই ময়লা হয়েছে।

সবাই আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। বড় বোন বাঁকা হাসি হেসে বলল, পির সাহেব!

আমি তাদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে সোজা আমার ঘরটাতে গেলাম, বিছানায় শওকত মামা ছটফট করছেন। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ লাল, দেখে চেনা যায় না। আমি বললাম, মামা, এই ঘরটা ময়লা হলেই বাসায় অসুখ হয়। কোনোকিছু কি ময়লা হয়েছে?

মামা কোঁকোঁ করে কী বললেন, বোঝা গেল না।

আমি বললাম, আপনি শুয়ে থাকেন, আমি দেখি ময়লা কিছু আছে কি না। একবার বিড়াল একটা ইঁদুর মেরে রেখেছিল।

ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কারই। শওকত মামার জন্যে একটা চৌকি পাতা হয়েছে, চৌকির নিচে তাঁর সুটকেস, জুতা ইত্যাদি। আমি ভালো করে খুঁজে দেখলাম ময়লা কিছু নেই। ছোটখাটো যা ছিল আমি ঝেড়েপুছে বের করে নিয়ে এলাম।

www.MurchOna.com

আমি শওকত মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, মামা, আপনি কি কখনো ঘরের ভেতরে পেচ্ছাব করেছেন? অনেক সময়—

পাশে বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বের করে দিলেন। কোনোমতে চোখের পানি সামলাতে সামলাতে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বড়দের মতো হৃদয়হীন মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

দুপুরের দিকে শওকত মামাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নেওয়া হল। বাসায় মোটামুটি একটা থমথমে আবহাওয়া। তখন দ্বিতীয় দুঃসংবাদটি পাওয়া গেল। মায়ের সোনার বালাজোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মায়ের বেশি গয়নাগাটি নেই, এই বালাজোড়াই আছে। সেটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার অর্থ খুব সহজ। বালাজোড়া চুরি হয়ে গেছে। প্রথম সন্দেহ স্বাভাবিকভাবে হল নূতন কাজের ছেলেটির উপর। ছোট ছোট কুটিল চোখ, দেখলেই কেন যেন মনে হয় সে এ-ধরনের কিছু-একটা কাজ করতে পারে। তাকে জেরা করা শুরু হল। বলা বাহুল্য, বলামাত্র সে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। কপাল ভালো শওকত মামা নেই, তা হলে এতক্ষণে রক্তারক্তি শুরু হয়ে যেত।

মায়ের বালাজোড়ার জন্যে বাসায় মোটামুটি শোকের ছায়া নেমে এল। মা কিছু বলছেন না, কিন্তু তাঁর ফ্যাকাশে মুখ দেখে আমার এত কষ্ট হল, বলার নয়! মনেমনে ঠিক করলাম যখন বড় হব তখন মাকে দশ জোড়া মোটা মোটা সোনার বালা তৈরি করে দেব। বালা চুরির খবর পেয়ে পাশের বাসা থেকে মহিলারা চলে এলেন। কোথায় কোন পির নাকি বাটি চালান দিতে পারে, তাকে খোঁজ দেওয়া যায় কি না সেটা নিয়ে আলোচনা হতে থাকল।

আমি এদিকে তখনও শওকত মামার ঘরের রহস্য ভেদ করা নিয়ে ব্যস্ত। মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ঘরে কিছু-একটা ময়লা জিনিস রয়েছে যার জন্য এসব হচ্ছে। শওকত মামাকে হাসপাতালে নেবার পর দ্বিতীয়বার তাঁর ঘরটা পরীক্ষা করতে গেলাম। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। তোশক উলটিয়ে দেখলাম, মশারির উপর, বালিশের নিচে। শুধুমাত্র সুটকেসের ভিতরটা দেখা বাকি। সুটকেস তালা মারা, তাই ভিতরে দেখা গেল না। এমন কি হতে পারে যে সুটকেসের ভিতরে কিছু-একটা ময়লা জিনিস রয়েছে? সম্ভাবনা কম, কিন্তু হতেও তো পারে। হয়তো একটা আম রেখেছিলেন খাবেন বলে। পরে খেয়াল নেই, আমটা পচে গেছে, পোকা হয়ে গেছে।

এরকম কিছু হওয়া তো এমন-কিছু অসম্ভব নয়—আমার নিজেরই হয়েছে। কিন্তু সেটা নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে সুটকেসটি খোলার কোনো উপায় নেই, সেটাই হয়েছে সমস্যা। ঠিক তখন আমার মাথায় হঠাৎ করে প্রচণ্ড বুদ্ধির একটা বিদ্যুৎঝলক হল—পুরো সুটকেসটাই ঘর থেকে সরিয়ে নিলে হয়, তা হলেই তো বোঝা যাবে। আমি তখন-তখনই টেনে-হিঁচড়ে সুটকেসটাকে আমাদের শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলাম।

www.MurchOna.com

সন্ধেবেলা বাসায় মোটামুটি শোকের ছায়া। শওকত মামার জন্যে দুশ্চিন্তা না করে সবাই মনে হচ্ছে সোনার বালার জন্যে দুঃখ করছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ বলেছিল আসবে, এখনও দেখা নেই। বাটি চালান দিতে পারে মানুষটির কাছে খোঁজ গেছে, ব্যস্ত মানুষ, আজ আসতে পারবে কি না সন্দেহ। সুরা নাসারা পড়ে ফুঁ দিয়ে চাল খেতে দিলে চোর নাকি সেই চাল চিবাতে পারে না। বাসায় কাজের ছেলেটিকে সেরকম চাল চিবাতে দেওয়া নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে, এরকম সময়ে রিকশা করে মামা নামলেন। পুরোপুরি সুস্থ মানুষ, তার এগাল-ওগালজোড়া হাসি। আমি চিৎকার করে বললাম, আমি জানতাম—আমি জানতাম—

উত্তেজনা একটু কমে আসার পর একজন জিজ্ঞেস করল, কী জানতি?

শওকত মামা ভালো হয়ে যাবেন।

কেমন করে জানতি?

আমার ঘরে খারাপ কোনো জিনিস থাকলে বাসায় অসুখ হয়।

শওকত মামা অবাক হয়ে বললেন, কী খারাপ জিনিস আছে ঘরে?

কিছু খুঁজে পাইনি, তার মানে নিশ্চয়ই আপনার সুটকেসের ভিতরে আছে।

শওকত মামা হঠাৎ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন, আমতা-আমতা করে বললেন, আমার সুটকেস? আ-আমার সুটকেস? আমি একগাল হেসে বললাম, আপনার ঘর থেকে বের করে ফেলেছি।

শওকত মামা ভয়ানক চমকে উঠে বললেন, কোথায়? কো-কো-কোথায় সুটকেস?

আমি টেনে-হিঁচড়ে শোয়ার ঘর থেকে সুটকেসটাকে নিয়ে এলাম। শওকত মামা একেবারে লাফিয়ে উঠে সুটকেসটা নিজের হাতে নিলেন।

আমি বললাম, আপনি ঘরে নেবেন না সুটকেসটা, তা হলে আবার আপনার পেটে ব্যথা হবে। আগে খারাপ জিনিসটা বের করে নেন ভিতর থেকে।

বাসায় সবাই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। বড় বোন বলল, মামা, খোলেন দেখি সুটকেসটা। পির সাহেবের কথা সত্যি কি না দেখি।

বাবা বললেন, মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। আগেও নাকি হয়েছে তার। খোলো দেখি সুটকেসটা।

শওকত মামা রক্তশূন্য মুখে আমতা-আমতা করে বললেন, কিন্তু চাবিটা-চা-চা-চাবিটা—

বড় বোন সুটকেসটা একনজর দেখে বলল, এইটার চাবি তো সবার কাছে আছে। দাঁড়ান, নিয়ে আসি আমি।

শওকত মামা শুকনো মুখে ঢোক গিলে বললেন, কিন্তু মানে ইয়ে—আমার—

www.MurchOna.com

শওকত মামাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি সুটকেসটা খুলতে চাইছেন না। বাবার একটু মায়া হল, বললেন, থাক থাক, সবার সামনে খুলতে হবে না। কী-না-কী গোপন জিনিস আছে ভিতরে। যখন সময় হবে তোমার ঘরে গিয়ে খুলো। খুলে দেখে আমাদের বোলো।

শওকত মামা একেবারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, ঠিক আছে দুলাভাই, বলব।

তারপর সুটকেসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কাজটি ভালো করলেন না।

আমার কেমন জানি একটা বাজে সন্দেহ হল। বড়দের নিয়ে এরকম সন্দেহ করা ঠিক না। কিন্তু মনের উপর তো আমাদের কোনো হাত নেই—সন্দেহ হলে আর কী করা যাবে? শওকত মামার সুটকেসের ভিতরে কিছু-একটা খারাপ জিনিস আছে, যেটা আমাদের কিছুতেই দেখাতে চান না। কী জিনিস সেটা? শওকত মামা যখন সুটকেস রেখে ঘর থেকে বের হলেন, আমি তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকালাম, আর হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম শওকত মামাও বুঝে গেছেন আমি কী সন্দেহ করছি।

রাতে খাবার পর শওকত মামা ঠিক করলেন তিনি কাজের ছেলেটাকে বালা চুরি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের ধরনধারণই আলাদা, বাসার পিছনে শিউলিগাছ থেকে একটা লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে এলেন।

রক্তারক্তি একটা ব্যাপার হয়ে যেত, কিন্তু মা খুব শক্ত গলায় বললেন যে ছেলেটির গায়ে হাত দেওয়া যাবে না।

শওকত মামা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনারা লাই দেন বলেই এরা এত সাহস পায়। চোরকে চুরি করতে দেবেন, তারপর তাকে বসিয়ে দুধকলা খাওয়াবেন, তা হলে এরা মাথায় উঠবে না তো কারা মাথায় উঠবে? ছোটলোকের জাত এরা—

আমি এই ফাঁকে শওকত মামার ঘরে চলে এলাম। বড়বোনের চাবিটি নিয়ে এসেছি, চট করে খুলে একবার দেখে নেব, কেউ বোঝার আগে।

সত্যি সত্যি চাবিটা দিয়ে সুটকেসটা খুলে গেল। ভিতরে উঁকি দিলাম আমি, জামাকাপড়, মেয়েদের ছবিওয়ালা কিছু রংচঙে বই—

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল, ঘুরে তাকিয়ে আমার রক্ত শীতল হয়ে গেল। শওকত মামা ঢুকেছেন ঘরে। আমাকে খোলা সুটকেসের সামনে দেখে তাঁর চোখগুলি একেবারে বাঘের মতো জ্বলে উঠল। হাতে শিউলির ডালটি ছিল, কাজের ছেলেটির উপর ব্যবহার করতে পারেননি, সেটা তুলে অসম্ভব জোরে আমার পিঠে মেরে বসলেন। শপাং করে সেটা একেবারে আমার চামড়া কেটে শরীরের ভিতরে ঢুকে গেল।

www.MurchOna.com

গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিতে গিয়ে থেমে গেলাম—আমি সত্যিই তো একটা গুরুতর অন্যায় করেছি। আরেকজনের সুটকেস খুলেছি গোপনে। একজন চোরের সাথে আমার পার্থক্য কোথায়? কেমন করে করলাম এত বড় অন্যায় কাজ!

শওকত মামা এগিয়ে এসে আবার নৃশংসভাবে মারলেন ডালটি দিয়ে। যন্ত্রণায় চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এল আমার, তবু আমি একটু শব্দ করলাম না। মুখ বুজে মার খেয়েও যদি ঘটনাটা অন্য সবার কাছ থেকে গোপন রাখা যায়!

শওকত মামা তখন এগিয়ে এসে আমার বুকের কলার চেপে ধরলেন, তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে উপরে তুলে দেয়ালের সাথে চেপে ধরলেন, মুখের কাছে মুখ এনে হিংস্র স্বরে বললেন, সেয়ানা ছেলে—আমার সাথে রংবাজি কর? তোমার রং আমি বার করি দাঁড়াও—

শওকত মামা তখন আমার গলা টিপে ধরলেন—দশ বছরের বাচ্চার কণ্ঠনালি চেপে ধরলে তার প্রাণ বের হয়ে যেতে পারে। আতঙ্কে এবার আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হল না। নিশ্বাস নেবার জন্যে হাঁসফাঁস করছি আমি—চোখের সামনে মনে হচ্ছে আঁধার হয়ে আসছে সব—

ঠিক সে-সময় আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলাম। শওকত মামার ঠিক পিছনে একজন লম্বা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি এত লম্বা যে তার মাথা ঠেকেছে ছাদে। মানুষটির চেহারা অদ্ভুত, কপালটা উঁচু হয়ে বের হয়ে আছে—এত উঁচু যে চোখ দুটি প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। মানুষটির পরনে আলখাল্লার মতো সাদা কাপড় একেবারে মেঝেতে নেমে এসেছে।

আমি দেখলাম লোকটা আস্তে আস্তে হাত তুলে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে শওকত মামাকে একটা চড় দিল। সেই চড় খেয়ে শওকত মামা প্রায় শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ঘরের কোনায় ছিটকে পড়লেন। প্রচণ্ড শব্দে তাঁর মুখ দেয়ালে গিয়ে লাগল—এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এল তাঁর নাক দিয়ে। আমি মেঝেতে পড়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম লম্বা মানুষটি একটুও না নুয়ে শওকত মামাকে তুলে আনল এক হাত দিয়ে, তারপর হাত ঘুরিয়ে আবার প্রচণ্ড চড় মারল তাঁর মুখে। শওকত মামা শূন্যে উঠে গেলেন, ছাদে আঘাত খেয়ে টেবিলের উপর পড়লেন প্রচণ্ড শব্দে। লোকটা আবার হাত বাড়িয়ে তুলে আনল শওকত মামাকে, রক্তে মাখামাখি শওকত মামার মুখ, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি দেখলাম লম্বা মানুষটি আবার হাত তুলেছে শওকত মামাকে মারার জন্যে। আমি আর পারলাম না—চোখ বন্ধ করে যত জোরে সম্ভব একটা চিৎকার করে উঠলাম। সাথে সাথে শুনলাম শওকত মামা

www.MurchOna.com

আছড়ে পড়েছেন ঘরের কোনায়—ঝনঝন করে কী যেন ভেঙে পড়েছে সাথে সাথে—

বাসার সবাই ছুটে এসেছে আমার চিৎকারে। দরজায় দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভিতরে। শওকত মামার সামনের দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছে, রক্তে-মাখামাখি সেই মুখ দেখতে কী বিচিত্র দেখাচ্ছে! শওকত মামা উঠতে পারছিলেন না—হাত তুলে কোনোমতে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন—ইকবাল—ইকবাল আমাকে মেরে—

কেউ কোনো কথা বলল না—অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। শওকত মামা গোঙাতে গোঙাতে বললেন, আর কেউ কি আছে ঘরে ইকবাল ছাড়া? আছে?

আমি মাকে ধরে হঠাৎ ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললাম, মা আমাকে শক্ত করে ধরে রাখলেন। বাবা কী করবেন বুঝতে না পেরে শওকত মামাকে টেনে তুলতে গেলেন। কাপড়-জামা ছিঁড়ে একাকার হয়ে গেছে, তাঁকে তুলতেই ছেঁড়া পকেট থেকে চকচকে একটা জিনিস বের হয়ে এল। গড়িয়ে গেল ঘরের কোনায়।

সবাই দেখলাম অবাক হয়ে—মায়ের সোনার বালা।

বড় বোন ফিসফিস করে বলল, দেখছ মা, মুতুয়াল পির কেমন জাঁদরেল পির!

পরিশিষ্ট

ভূত বলে কিছু নেই। কখনো ছিল না, কখনো থাকবেও না। কিন্তু ভূতের গল্প আছে—আগেও ছিল, আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবে। নিশিরাতে রাতজাগা পশুর ডাক শুনতে শুনতে আগুনের পাশে বসে ভূতের গল্প শোনার থেকে মজার ব্যাপার আর কী হতে পারে?

ভূতের গল্পের সত্যিকার আনন্দটুকু আসে ভয়-পাওয়া থেকে, ভয়টা আরও খাঁটি হয় যদি কেউ মনে করে গল্পটা সত্যি। সে-কারণে এই বইয়ের গল্পগুলিতে নাম, কাল, পাত্রের জায়গায় নিজের নাম, কাল, পাত্র ব্যবহার করে এমন একটা ভাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যেন মনে হয় গল্পগুলি সত্যি। কিন্তু গল্পগুলি সত্যি নয়। মনে হয় সেটা বলে দেওয়া ভালো।

Pishachini by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com